অশোক চট্টোপাধ্যায়

গোল



গোল

অশোক চট্টোপাধ্যায়

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স : ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলকাতা ৭০০০৭৩

রচনাকাল
জ্বলাই ১৯৭৯

প্রথম প্রকাশ
জ্বলাই ১৯৮৩
আষাঢ় ১৩৯০

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ.
নাথ পাবলিশিং
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

ম্দ্রাকর
পরেশনাথ পান
ইন্দ্রলেখা প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

দশ টাকা

বাবা ও মাকে

অন্ধকারের মধ্যে বড় বড় চোখে তাকাল সুরঞ্জন। তারপর বিছা-নায় পাশ ফিরে শুতে গিয়ে আওয়াজটা স্পষ্ট শুনতে পেল। বাইরের লোহার দরজার পাশে কাঠের ছোট দরজাটা কেউ ধাক্কাচ্ছে, আর নাম ধরে ডাকছে সুরঞ্জনের। এ শব্দেই ঘুম ভেঙ্গেছে তার। সুরঞ্জন তক্ষুণি বিছানা থেকে উঠল না। আন্দাজ করার চেষ্টা করল এখন রাত কত হতে পারে। বারোটার কম নয়। এত রাতে কে ডাকে? 'রঞ্জু—এই—রঞ্জু···কী ঘুম রে···।' ছোটমামার গলা, সুরঞ্জন এক লাফে বিছানা ছাড়ল। বালিশের পাশ থেকে টর্চটা তুলে নিয়ে, খানিকটা উদ্বেগ আর উত্তেজনার মাথায় দ্রুত বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সুরঞ্জন নিশ্চিত ভাবল যে, কিছু একটা বিপদ বা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে কয়েক-পা লম্বা ফালি বারান্দা। মাথায় টিনের চাল। দু'পাশে বাগান। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চোখ তুললে আকাশ দেখা যায়, সুরঞ্জন দেখল মেঘে জমাট আকাশটা নিচু হয়ে এসেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর খুব সূক্ষ্ম ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে, সেটা ফাঁকায় হাত বাড়িয়ে বুঝতে হল।

সুরঞ্জন দরজার কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে আর একবার ধাক্কার আওয়াজ ও ডাক কানে এল। একটা বিশাল খিল, দু দুটো ছিটকিনি খুলতে খানিকটা সময় গেল। তার আগেই বাইরে থেকে আওয়াজ এল, 'কে রে, রঞ্জু?'

—'কে ছোটমামা?'

—'হ্যাঁ, শিগ্‌গির খোল্—সেই কখন থেকে ভূতের মত অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি।'

ছোটমামার কথার ধরনে সুরঞ্জনের মনে হল ব্যাপারটা বোধহয় ততটা জটিল নয়। দরজার দুটো পাল্লা একটানে খুলে ফেলেই সুরঞ্জন

টর্চের আলোটা সরাসরি ছোটমামার মুখের ওপর ফেলল। চোখে আলো পড়ায় চোখ বুজে ডান হাত দিয়ে মাছি তাড়াবার মত করে আলোটাকে ঝেড়ে ফেলার নিষ্ফল চেষ্টা করল। ছোটমামার পেছনে আর একজন দাঁড়িয়ে। দীর্ঘ, কালো পেটানো চেহারা। লম্বা মুখ, থুতনির কাছে কাটা দাগ। এক-মাথা ঝাঁকড়া চুল, এখন কপাল থেকে নেমে ভ্রূ পর্যন্ত ঢেকে ফেলেছে, ঠিক তার তলায় গম্ভীর বিষণ্ণ দুটি চোখ, ওর দিকে চোখ পড়তে আপনিই সুরঞ্জনের হাতের টর্চটা নিভে গেল। ততক্ষণে ছোটমামা সুরঞ্জনকে প্রায় ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। 'জয়ন্ত আয় রে—!'

সুরঞ্জন এবার টর্চের আলোটা ফেলল নিচু করে। ছোটমামা বারান্দা দিয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, পেছনে জয়ন্ত মিত্র, সবশেষে টর্চ হাতে সুরঞ্জন। জয়ন্ত ডান পা-টা একটু টেনে হাঁটছে।

—'আমি জানি বাইরের দিকের ঘরটায় তুই শুয়ে থাকিস···তাই তোর নাম ধরে···এই ঘরে লাইটের সুইচ কোথায়···?'

'দাঁড়াও, লণ্ঠন জ্বালছি। আলো জ্বলবে না। কী একটা কেব্‌লে গণ্ডগোল হয়েছে। এখানে পরপর চোদ্দ পনেরটা বাড়িতে টোট্যাল ব্ল্যাক আউট।'

'যাঃ বাবা! একটা গামছা বা তোয়ালে দে, মাথাটা ভিজেছে।' সুরঞ্জন দুটো গামছা এনে নিঃশব্দে দুজনের হাতে দিল। তারপর লণ্ঠন জ্বালানোর সময় খেয়াল করল জয়ন্ত মিত্র দাদুর বড় কাঠের সিন্দুকটার ওপর গামছা হাতে স্থির হয়ে বসে আছে।

—'তোমরা খাবে তো? কখন বেরিয়েছো কলকাতা থেকে? কিসে এলে?'

—'সেজদিকে ডাকবি?'

—'তুমি বসো, আমি মাকে ডাকছি।'

সুরঞ্জন ঘর থেকে বেরিয়ে পেছনের বারান্দায় পা দেওয়ার আগেই ছোটমামার ডাক কানে এল, 'রঞ্জু, একবার দেখে যা।'

সুরঞ্জন ঘরে ঢুকে দেখল জয়ন্ত মিত্র শরীরটা বেঁকিয়ে দ'য়ের মত

বসে আছে। মুখটা দু'হাতের তালুতে ডোবানো। ছোটমামা লণ্ঠন হাতে ওর পাশে দাঁড়িয়ে।

'দেখ্—!' একটানে জয়ন্তের ঢোলা প্যান্টটা হাঁটু পর্যন্ত তুলে ধরল। 'থেঁতলে দিয়েছে, জার্সিটা ভিজে গিয়েছিল রক্তে··' জামাটা তুলতে সুরঞ্জন দেখল জয়ন্তের পিঠে দু' জায়গায় বড় করে প্লাস্টার আটকানো। 'মুখটা বেঁচে গেছে। সেটাই ভারী আশ্চর্য! লোকে তো ঘুসি-টুসি-গুলো মুখেই মারে।'

ছোটমামা জয়ন্ত মিত্রের মাথায় হাত রেখে বাঁকা চোখে একবার তাকাল সুরঞ্জনের দিকে। 'তুইও মার, গায়ের ঝালটা মিটিয়ে নে—' আর ঠিক সে সময় জয়ন্ত মিত্রের স্থির শরীরটায় ঢেউ খেলে গেল। কঁকিয়ে কেঁদে উঠল 'না-না-না!' সুরঞ্জনের মনে হল জয়ন্ত হয়ত বিশ্বাস করেছে, সে তাকে সত্যি সত্যি মারবে।

সুরঞ্জন ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে নির্ঘাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠত, তাই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল। অন্ধকার বারান্দার এক পাশে সার বাধা তিনটে ঘর। বাঁদিকে তরকারির বাগান। সামনের বাগানটার কন্টিনিউয়েশন। পেছনে তরকারি বাগান হলেও মা দুটো কাঞ্চন ফুলের গাছ লাগিয়েছিল—শ্বেত আর রক্ত। শ্বেত কাঞ্চনের গাছটা ফুল ফুটে সাদা হয়ে রয়েছে। অন্ধকার বারান্দায় কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সুরঞ্জন। বর্ষার ভেজা বাতাসে শীত করছে, বৃষ্টির ফোঁটা একটু বেড়েছে, টিপ টিপ আওয়াজটা জোরে হচ্ছে।

তিনটে ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করল সে। একদম কোণায় কুয়োতলার পাশের ঘরটা দাদুর। মাঝখানেরটায় বাবা আর মা। তার পরের ঘরে তিন্নি আর দিদি ঘুমোয়। মাকে ডাকার আগে সুরঞ্জন জয়ন্ত মিত্র'র মুখটা মনে করার চেষ্টা করল। শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখে একটু আগে কান্না এসেছিল, কিন্তু এখন ও স্পষ্ট উচ্চারণে নিচু গলায় শুধু নিজেকে শোনাবার মত করে বলল, 'ঘুষখোর, বিশ্বাসঘাতক, ট্রেটর। তারপর হঠাৎই মনে পড়ে গেল শূন্যে ডিগবাজি

খাওয়া একটা রঙিন ছবির কথা, বলটা বুটের ধাক্কায় দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে। পেছনে আবছা গ্যালারির আভাস। ম্যাগাজিনের পাতা থেকে কেটে, যত্ন করে সেলোটেপ দিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে আটকে রেখেছিল। বিকেল থেকে একবারও ছবিটার কথা মনে পড়েনি, তা হলে হয়ত এতক্ষণে একটানে ছিঁড়ে ফেলত। 'জয়ন্ত মিত্র, তুমি বিশ্বাসঘাতক! ট্রেটর! ক্লাবের সঙ্গে, সাপোর্টারদের সঙ্গে বেইমানি করেছ।'

মাকে বারদুয়েক ডাকতেই দাদুর ঘর থেকে সাড়া এল, 'কিরে রঞ্জু, পেট কামড়াচ্ছে নাকি?' উঃ! দাদুকে নিয়ে হয়েছে এক জ্বালা। নিজে পাশ করা হোমিওপ্যাথ। কিন্তু প্রথম জীবনে প্র্যাকটিস করেননি। রেলে চাকরি করতেন, স্টেশন মাস্টার হয়ে রিটায়ার করেছেন। তারপর থেকে প্র্যাকটিস শুরু করেছেন। মূলত নিখরচায়। তবু রুগী হয় না দেখে, প্রধান ঝামেলাটা পোহাতে হয় বাড়ির লোকদের। দাদুর কাছে যে কোন ঘটনা মানেই শারীরিক অসুস্থতা। দাদুর ঘরে লণ্ঠন জ্বালানোর তোড়জোড়। খক্ খক্ কাশি। বারকয়েক আরো ডাকতে মার ঘুম ভাঙল। 'কিরে রঞ্জু!' এত রাতে রঞ্জুর ডাকে ঘুম ভেঙে মা উতলা হয়ে ছুটে এসে দরজা খুলল।

দরজা খোলার আগেই দু'দিক থেকে দু'দুটো লণ্ঠনের আলো বারান্দায় এসে পড়ল। ছোটমামা আর দাদু দুজনেই বেরিয়ে এসেছে। ছোটমামার দিকে চেয়ে দাদু অবাক হল, মাকে কেউ কিছু বলার আগেই দাদু বলল, 'বৌমা! তোমার ভাই এত রাত্তিরে!' দাদুর কথায় খেয়াল না করে মা ছোটমামার দিকে চাইল।

'সেজদি, এদিকে একটু শুনে যা।

মা আর ছোটমামা বারান্দার কিনার ঘেঁষে নিচু গলায় কথা বলছে। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে দাদু আর সুরঞ্জন। মধ্যরাত্রির নাটকটা বোঝার জন্য দাদু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে।

ওদের দুজনের চাপা গলার কথায় সুরঞ্জন একবার তার নিজের নামটা শুনল। মা একবার ওর দিকে ফিরে তাকাল। তারপর ছোটমামা

গম্ভীরমুখে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে ঘরে ফিরে গেল।

দাদু এতক্ষণ বোধহয় দম বন্ধ করে কৌতূহল আটকে রেখেছিল। ছোটমামা সরে যেতেই দাদু ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'বৌমা এনিথিং সিরিয়স ?'

—'নাথিং !' মা একটু মিষ্টি করে হাসল, সে সময়ে ভেজা বাতাস বাইরে থেকে হঠাৎ হুড়মুড় করে ছুটে এসে বাকি লণ্ঠনের আলোটা কাঁপিয়ে দিল। ওদের তিনজনের ভূতুড়ে ছায়াটাও রহস্যজনকভাবে কেঁপে কেঁপে উঠল। 'ছোট্টু কলকাতা থেকে ওর এক বন্ধুকে নিয়ে এসেছে। বন্ধুটি দিনকয়েক এখানে থাকবে।'

—'এত রাত্তিরে ! এলো কী করে ?'

—'ওদেরই এক বন্ধু গাড়িতে দুর্গাপুর যাচ্ছিল, ওদের এখানে নামিয়ে দিয়ে গেছে।—বাবা ! আপনি এখন শুয়ে পড়ুন। সকালবেলা কথাবার্তা হবে।'

দাদুর পুরো কৌতূহল মেটেনি। কিন্তু এত রাত্রে জেরা করে কোন সুবিধে হবে না বুঝে শুধু বলল, 'বৌমা, কাল মর্নিং টির সঙ্গে ঘটনার ডিটেলসটা চাই। —ওদের খাওয়া শোয়ার ব্যবস্থা কর। দরকার হলে রঞ্জু আমার ঘরে শুতে পারে।' বলতে বলতে দাদু লণ্ঠনটা ফেলে রেখে অন্ধকারেই নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

এখন বারান্দায় মা আর রঞ্জু মুখোমুখি। সুরঞ্জনের ওর মাকে ভারী সুন্দরী মনে হয়। এখন লণ্ঠনের মোলায়েম আলোতে আরো বেশি সুন্দরী মনে হল। 'রঞ্জু, খেলায় হারজিত আছেই। জানি আজকের হারটা এক ধরনের দুর্ঘটনা। তবু তা নিয়ে মন খারাপ করতে নেই, আর কারোর ওপর রাগ পুষে তো রাখতে নেই-ই।' মায়ের বলার ধরনটা অন্যরকম লাগল সুরঞ্জনের। মা তাকে উপদেশ দিচ্ছে, প্রয়োজনে মাঝে মাঝেই দেয়, কিন্তু আজ এই মধ্যরাতের উপদেশের ধরনটা সম্পূর্ণ আলাদা। সুরঞ্জনের মনে হল মা তার কাছে আসলে প্রার্থনার ভঙ্গিতে কিছু বলছে।

'জয়ন্তবাবু আমাদের অতিথি। বিপদের সময় সে আশ্রয় নিতে এসেছে, আমার মনে হয়, তাকে নিশ্চয় আমরা বিমুখ করব না।'

আজ বিকেলে রেডিওতে শোনা কয়েকটা কথা, মনের মধ্যে যেন একটা টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করা রয়েছে। বারবার বেজে উঠছে। সুরঞ্জন স্পষ্ট শুনতে পেল ঈষৎ খোনা গলায় ভাষ্যকার বলছেন—'খেলা দ্বিতীয়ার্ধে কুড়ি মিনিট অতিক্রম করে গেছে। এখনো পর্যন্ত কোন পক্ষই কোন গোল করতে পারেনি। খেলা চলছে খানিকটা ঢিমে তালে, দু'পক্ষই নিজেদের ঘর সামলাতে বড় বেশি ব্যস্ত। তাই খেলা হচ্ছে মূলত রক্ষণাত্মক। ·· কমল দাসের পায়ে বল, মাঝমাঠ অতিক্রম করে দ্রুত গতিতে ঢুকে পড়েছেন, রাইট ব্যাক অনন্ত মাঝি বাধা দিতে গিয়েছিলেন—পারেননি, কমল দাস এখন ফাঁকায়, লোক খুঁজছেন কাকে বল দেওয়া যায়···কমল পুশ করেছেন স্যামুয়েলের দিকে। জয়ন্ত মিত্র স্যামুয়েলকে বাধা দিতে আসছে···স্যামুয়েল তার আগেই থ্রু বাড়িয়েছেন যোধ সিং-এর দিকে···জয়ন্ত মাঝখান থেকে ছোঁ মেরে···।' সুরঞ্জন আবার বলল মনে মনে, ট্রেটর, বিট্রেয়ার, বিশ্বাসঘাতক, চোর-চোট্টা ঘুষখোর।

'তোমাদের মত কতগুলো নির্বোধ ফুটবল ফ্যান খেলাকে দিন দিন জটিল করে তুলছ। জয়ন্তবাবুকে যেভাবে মারা হয়েছে, তা দেখে তোমাদের সকলের লজ্জা হওয়া উচিত।' মা-র গলার স্বরটা তীব্র তীক্ষ্ণ, বর্ষার জোলো বাতাসের মত মুখের ওপর ঝাপটা দিল।

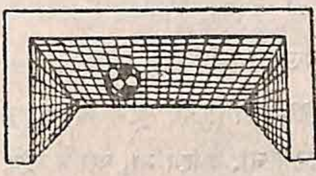
সুরঞ্জন খুব মৃদুস্বরে বলল 'মা'। ডাকটা মা-র কানে পৌঁছল কিনা কে জানে। সুরঞ্জনের মনের মধ্যে টেপ রেকর্ডারটা বেজে চলেছে, '· একটা কথা আমরা বারবার বলেছি, ভেজা মাঠ, বেশ পেছল। তার ওপরে এতক্ষণ খেলা হওয়ায় বুটের চাপে ঘাসের তলার কাদাটা ওপরে উঠে এসেছে···মনে হয় জয়ন্ত মিত্র ঠিকমত ভারসাম্য বজায় রাখতে না পারায় পা পিছলে গিয়েছিল, বুটের ডগায় লেগে···'

এমন সময় মাঝের ঘরটার ভেতরে খুটখাট আওয়াজ পাওয়া গেল। বাবার ঘুম ভেঙেছে তার মানে। বাবা বাইরে আসতে গিয়ে অন্ধকারে কিসে যেন হোঁচট খেল। তারপর বেরিয়ে ওদের দেখে প্রথমে একটা বিরাট হাই তুলল, বার চারেক তুড়ি দিল। 'কি ব্যাপার বল তো, একে

মাঝ রাত, তার উপর বৃষ্টি বাদলা। লণ্ঠন জ্বেলে জোলো হাওয়ায় দাঁড়িয়ে ছেলে শাসন করছো?' মা স্পষ্ট বিরক্তির ভাব করল। 'কলকাতা থেকে ছোট্টু এসেছে।'

—'তা ওর কি দোষ? ও কী ডেকে এনেছে? ওকে বকছ কেন?'

—'রঞ্জুর ঘরে ছোট্টু আর তার এক বন্ধু আছে। তুমি গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বল। নিজে কিছু বল না, ওদের কথা বুঝতে চেষ্টা কর। আর রঞ্জু তুমি গিয়ে বাবার জায়গায় শুয়ে পড়।'



ডান পাটা মনে হচ্ছে পাথরের মত ভারী হয়ে বিছানার সঙ্গে লেগে রয়েছে। সারা গা হাত পায়ে ব্যথা। চোখ জ্বালা করছে, জল গড়াচ্ছে। মাথাটার মধ্যে মনে হচ্ছে বর্ষার ঘোলা জল ঢুকে গেছে। নাড়লে চাড়লে ভেতরটা কলকল করছে। খুব কষ্ট করে একবার চোখ খুলল। ঘরের ভেতর ঝাপসা অন্ধকার।

কষ্ট করে মাথাটা একটু নাড়তেই ছোট্টুদার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। ছোট্টুদা রাতে লুঙ্গি করে পরা দিদির শাড়িটা ছেড়ে আবার শার্ট প্যাণ্ট পরে নিয়েছে। ছোট্টুদা একগাল হাসল, 'কিরে কেমন আছিস?' তারপর কপালে হাত দিয়ে বলল,'না জ্বরটা একইরকম আছে। ওঃ কাল সারাটা রাত যা কঁকিয়েছিস, ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি। এ বাড়ির সিনিয়র মোস্ট মেম্বার একজন এইচ এম বি পাশ করা হোমিওপ্যাথ, একটু বাদেই ভিজিটে আসবেন।'

—'হোমিওপ্যাথিতে কি—?'

—'ভয় নেই, এ্যালোপ্যাথিও সাথ সাথ চলবে। কাছে একজন নামজাদা হাকিম আছে, দরকার হলে তাকেও ডাকা হবে।'

—'তুমি কি আজই কলকাতায় যাচ্ছো?'

—'বাঃ যেতে হবে না, ওদিকে বিস্তর কাজকর্ম পড়ে আছে।'

—'তা আমাকেও নিয়ে চল।'

—'তা আর নয়? যত রাজ্যের আকাম কুকাম করে রাখবে। সাপোর্টাররা তো জ্যান্তে চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে ডুগডুগি বাজাবে।'

—'ধেৎ! আমি একা একা কি করে থাকব?'

—'একা মানে! ছ ছ'জন ফ্যামিলি মেম্বার, তোকে নিয়ে সাতজন, একা হল?'

—'সারা গা হাত পায়ে বিষম ব্যথা, উঠে বাথরুমে যেতে পারব কিনা—'

—'তাতে কি, বেডপ্যান দেবে।'

—'প্লিজ ছোট্টুদা, আমাকে তুমি বাড়ি নিয়ে চল, যা হয় হবে। দেখ এরা আমাকে চেনে না, জানে না, আমি যদি এভাবে জুলুম করি, ছিঃ ছিঃ সত্যি যদি বেডপ্যান নিতে হয়—ছোট্টুদা আমাকে ধরো তো আমি ঠিক উঠে দাঁড়াব।'

ছোট্টুদা জয়ন্তকে দু'হাত ধরে টেনে খাটের ওপর বসাল। জয়ন্ত মুখটা বিকৃত করে ব্যথার ধকলটা সামলালো। 'এক নম্বর পরীক্ষায় পাশ। এবার দু'নম্বর পরীক্ষা, নিজের পায়ে দাঁড়ানো, তিন নম্বর পরীক্ষা, হাঁটি হাঁটি পা পা।'

ছোট্টুদার কথার ধরনে জয়ন্ত হেসে ফেলল, ধরে ধরে বাথরুম থেকে ঘরে আসার পথে জয়ন্ত ছোট্টুদাকে বলল, 'আমাকে একটা লাঠির ব্যবস্থা করে দিয়ে যেও, তাহলে আমি নিজেই চলাফেরা করতে পারব।'

—'হাঁটতে গিয়ে কিছু বুঝলি?'

—'হ্যাঁ, ডান পায়ের পাতায় আর কোমরে ব্যথা, আমাকে যখন টেণ্টেও দরজায় সবাই মিলে ধরে পেটাচ্ছে, তখন মনে আছে গদা বোস হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল।'

—'ওই তো তোকে বাঁচাল।'

—'সিওরলি, কিন্তু বিশ্বাস কর আমি স্পষ্ট টের পেয়েছি, ও ভিড় হাটাবার সময় দাঁতমুখ খিঁচিয়ে আমার কোমরে দুটো টেরিফিক কিক ঝেড়েছিল।'

—'বলিস কিরে, গদা ! ও তোকে রেসক্যু না করলে তো তুই মারা পড়তিস।'

—'আরে তা তো ঠিক কথা, কিন্তু সবাই মারছে, গদা ভাবল ওই বা কেন বাদ যায়। সেকেণ্ড লাথিটার পর আমি মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিল। ও ফিক করে হেসে মুখটা ফিরিয়ে নিল।'

—'ভারী ওস্তাদ তো।'

—'ওই মোক্ষম লাথি দুটো কোমরটাকে একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।' কথা বলতে বলতে জয়ন্তর চোখ দুটো ঘুরছিল। জানলা দিয়ে বাইরের আকাশটা দেখল। বৃষ্টি বন্ধ, কিন্তু জল ভরা গম্ভীর মেঘ থম্ ধরে রয়েছে। ঘরের ভেতরটা কেমন স্যাঁতসেঁতে ভাব। বাসি বিছানার মধ্যে চাদর বালিশ সব দলা পাকানো। আধময়লা মশারি দুটোর দুটো কোণা খোলা অবস্থায় ঝুলছে। একটা কাঠের সিন্দুক, তাতে ইয়া বড় একটা তালা। কি সম্পদ আছে কে জানে। তার পাশে একটা ছোট বুক র‍্যাক—পড়ার আর গল্পের বই ঠাসাঠাসি করা। তারপর একটা পাল্লা বন্ধ আলমারি আর আলমারির পাশে দেওয়ালের ছোট্ট ফালিটায় ? ওদিকে চোখ পড়তেই লজ্জায় মুখটা নিচু হয়ে এল। জয়ন্তের একটা রঙীন ছবি, ম্যাগাজিনের পাতা থেকে যত্ন করে কেটে নেওয়া।

—'ছোট্টুদা ! এ ছবিটা কে লাগিয়েছে ?'

—'তোর একজন ফ্যান ! কাল রাতে যে দরজা খুলেছিল ?'

—'আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল ছোট্টুদা।'

—'ধ্যাৎ ! ঘ্যান ঘ্যান করবি না তো। নিয়ে যাবার অবস্থা হলে ঠিকই নিয়ে যাব। — কি ব্যাপার বলতো চা-ফা এখনো দিল না।'

—'আবদার ! কাল রাত একটায় লুচি আলুভাজা করে খাইয়েছেন। সকাল হতে না হতেই চা। ছোট্টুদা আমার মাথার ভেতরটা কেমন ঝিমঝিম করছে।'

—'বেশি কথাবার্তা বলিস না, চুপচাপ শুয়ে থাক।'

ঘুম আর জেগে থাকার মত মাঝামাঝি জায়গায় জয়ন্তর সময়টা কাটছে। ঘরের মধ্যে লোকজনের চলাফেরা কথাবার্তা অস্পষ্টভাবে

টের পাচ্ছে। হোমিওপ্যাথ নয়, একজন এ্যালোপ্যাথ ডাক্তার এসে বেশ অনেকক্ষণ ধরে টিপে টিপে পরীক্ষা করে গেছে। সেই ডাক্তারবাবু জয়ন্তকে অনেক কিছু জিগ্যেস করেছিল, জয়ন্ত বোধহয় তার উত্তরে একটা কথাই বারবার বলেছে. 'ব্যথা, বড় ব্যথা।'

একসময় জয়ন্ত বেশ বড় করে চোখ মেলল। শরীরের গরম ভাবটা অনেক কম মনে হচ্ছে। মাথার ভার ভার ভাবটা কেটে গেছে। জয়ন্তের মনে হল ইচ্ছে করলে সে এখন উঠে বসতে পারে, দাঁড়াতে পারে, এমনকি দু' চার কদম হেঁটে বেড়ানো তার পক্ষে কোন জটিল ব্যাপার নয়। বালিশের তলায় হাত ঘড়িটা রাখা ছিল, সেটা বের করে দেখল তিনটে বাজতে মিনিট পাঁচেক বাকি। জানলা দিয়ে বাইরে তাকানো মাত্রই হুড়মুড় করে ঝেঁপে বৃষ্টি এল। বৃষ্টিটা যেন জয়ন্তের দৃষ্টিপাতের জন্যই অপেক্ষা করে ছিল।

ভেজা মাঠে জয়ন্ত ভাল খেলে। এ খ্যাতিটা তার ছেলেবেলা থেকেই। পরশু সন্ধ্যায় বৃষ্টিটা যখন চেপে এল তখন জয়ন্ত আর ছোট্টুদা এক ঘরে বসে। ছোট্টুদা চিন্তিত মুখে বাইরে তাকিয়ে বলল, মনে হচ্ছে বৃষ্টিটা কনটিনিউ করতে পারে—জ্বালাবে।'

জয়ন্ত আড়মোড়া ভেঙে বলল, ছোট্টুদা একটা সিগারেট ছাড়োতো?

—'বড্ড বেশি খাচ্ছিস। একদম খাস্ না, বিকেল থেকে এই নিয়ে চারটে হল।'

—'কি করব বল, ভাল লাগছে না যে, কালকের টিম সিলেকশন নিয়ে কিছু শুনলে?'

—'সেটা পি সি ঘোষের ব্যাপার। শেষ মিনিট পর্যন্ত সাসপেন্সে রাখবে। তবে তুই খেলছিস্। আমাদের ডিপ ডিফেন্সে, বিশেষ করে মাঠ ভেজা থাকলে তোকে ছাড়া তো ভাবাই যায় না।'

—'আর ভাল লাগছেনা ছোট্টুদা, কালকের শীল্ড ফাইনালটা শেষ হলে যেন বাঁচা যায়। তোমার কথায় তো সেমিফাইনাল খেলার পর মাঠ থেকে সোজা এখানে শেলটার নিয়েছি। —টিকিট টিকিট করে সব কটা লোক ক্ষেপে গেছে। খেলা তো হবে ওই ঘোড়ার ডিমের—'

—'তুই একথা বলছিস, পি সি শুনলে দেখিয়ে দেবে--'

—'দেখাবে আবার কী? বড় জোর টিম থেকে বাদ দেবে।'

—'তুই সুপার স্টার তোকে কে বাদ দেবে? ড্রেস করে সাইড লাইনের ধারে বসে থাকতে দেখলে সাপোর্টাররা ক্ষেপে যাবে। তোকে পি সি অন্যভাবে ডোবাবে। আজ সকালে মেসে গিয়েছিলাম। যা বুঝলাম কল্লোল আর মধু এখন দু'জন দু'জনকে এ্যাভয়েড করছে। ফার্স্ট টিমে রাইট আউটে কে থাকবে যতক্ষণ না জানা যাচ্ছে, ততক্ষণে এই অস্বস্তিটা ওদের মধ্যে থাকবে।'

—'পি সি-র সাসপেন্স ড্রামায় কল্লোল আর মধু এখন কাটা সৈনিক। গুচ্ছের প্লেয়ার নিয়ে রাখবে, তারপর টিম তৈরি নিয়ে ফালতু ঝামেলা হবে। তোমরা কর্মকর্তারা, ছোটুদা মনে কিছু ক'রো না; পয়লা নম্বরের—।'

—'বাজে বকবি না জয়ন্ত, তুই এত বেশি বকিস বলেই তো তোর কিছু হলনা। নেহাতই ভাল খেলিস, না হলে তোকে কবে শেয়ালে টেনে নিয়ে যেত।'

জয়ন্ত খাটের ওপর আধশোয়া হয়েছিল, তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, 'ফালতু বাতেলা দেবেনা তো, তুমি বলছো বলেই ভাল খেলোয়াড় হয়ে যাব? এবারের সন্তোষ ট্রফিতে গিয়ে রোজদিন ড্রেস করে সাইড লাইনে বসে রইলাম। ইণ্ডিয়া ব্লেজার গায়ে দেবার চান্স এসেছিল চারবার, পরেছি মাত্র একবার।'

— 'এগুলো কি ক্লাবের ক্লিকবাজি?'

—'নাঃ, আমার ভাগ্যের ক্লিকবাজি।'

—'তুই তোর রাগ, বিক্ষোভ, ক্ষ্যাপামিগুলো কমা তো, এইসব নিয়ে অনেক বিরূপ কথাবার্তা হয়—।'

—'কারা বলে, ক্লাব অফিসিয়ালরা? ওদের নামেও আমরা অনেক কিছু বলি। শোধবোধ হয়ে গেল।'

জয়ন্ত পাজামা পরেছিল। সেটা ছেড়ে প্যাণ্ট পরতে পরতে বলল, 'ছোটুদা আমি বাড়ি যাব।'

—'মাইরি জয়ন্ত, তুই রেগে গেছিস। একটু ঠাণ্ডা হ। আজ তোর বাড়ি যাওয়াটা খুব খারাপ হবে। বাড়ি আছিস জানলেই আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবরা টিকিটের জন্য ছেঁকে ধরবে, তোর একটা মেণ্টাল ডিস্টারবেন্স হবে; কালকে বিগ ম্যাচ—।'

জয়ন্ত দেখল ছোট্টুদার গোলগাল ফর্সা মুখে অদ্ভুত একটা ছাপ—ঠিক তোষামোদ নয়, খানিকটা নষ্টামির ভাবও মিশে আছে। জয়ন্ত জানে লোকটা চুপচাপ থাকে, প্লেয়ারদের সঙ্গে দহরম মহরম আছে, বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় নিপাট ভাল মানুষ ; কিন্তু ব্যাটা নির্ঘাৎ গভীর জলের মাছ। না হলে বছরের পর বছর কর্মকর্তার আসনটা ওভাবে আগলে রাখা যায় না।

জয়ন্তের এখন নানা কারণে রাগ হচ্ছে। তার সব কটা কারণ জয়ন্তের নিজেরও জানা নেই। তবু বুঝতে পারছে, মস্তিষ্কের কোন এক অংশ থেকে স্বতোৎসারিত ক্রোধ তার শিরা ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে। হাতের বাইসেপস ট্রাইসেপসগুলো চাঙা হয়ে উঠছে। শিকারী বেড়ালটা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে যে ভাবে একটু থমকে দাঁড়ায়, জয়ন্ত ঠিক সে ভাবে টেবিলটার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। ও হাতটা তুলে এক-পা এগোতেই, কেউ যেন সুইচ টিপে আলো নেভাবার মত, তার রাগের গনগনানিটা নিভিয়ে দিল। জয়ন্ত এবার বেশ ঠাণ্ডা মাথায় বুদ্ধি করে রাগ দেখাল। 'আমি বাড়ি যাব, নয়তো একটা ফোন করব বাড়িতে।'

—'কেনরে, বাড়ির খবর দরকার? সেসব আমরা নিয়েছি। তুই ঘাবড়াচ্ছিস কেন?'

—'তোমরা প্রয়োজনে মিথ্যে কথাও বলতে পার। আমার মা ব্লাড প্রেসারের রুগী। আমি মা'র সঙ্গে নিজে কথা বলে জানতে চাই, মা কেমন আছে?'

—'কি করে ফোন করবি? এখানকার ফোনটাতো খারাপ। আর তুই এখন অজ্ঞাতবাসে আছিস, পাব্লিক জানতে পারাটা ঠিক নয়। না হলে তো কাছেই ওষুধের দোকানে নিয়ে যেতে পারতাম।'

—'তা এখানকার ফোনটা খারাপ কেন?'

—'এটা একটা প্রশ্ন হল ? কলকাতার টেলিফোন, খারাপ না হয়ে কতক্ষণ থাকে ?' ছোট্টুদা রসিকতার ঢঙে 'হ্যা-হ্যা' করে হাসতে লাগল।

—'ক্লাবের এত টাকা, এত ক্ষমতা, এত চেনা জানা, একটা টেলিফোন সারাই হয় না ? ফালতু কথা অন্য জায়গায় বলবে।' জয়ন্ত সব কটা কথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে চোখ মুখ লাল করে বলল।

—'এই তুই কিন্তু মাইরি পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করছিস্। কাল খেলা, আজ রাতে তোর এতটা উত্তেজনা ভাল নয়।'

একটা মেয়েলি মিহি গলা-খাঁকারিতে জয়ন্তর সম্বিৎ ফিরল। ও জানলা দিয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। চোখ ফিরিয়ে তাকাতে গিয়ে মাথার ভেতরটায় 'ঝন্' করে উঠল। দরজার চৌকাঠে ঠিক একটা ফ্রেমে আঁটা লাইফ সাইজ ছবির মত সোনালী আর আকাশী নীলে ছাপা একটা শাড়ি পরে একজন দাঁড়িয়ে। চুলটা খোলা, এক হাতে বালা, সেটা খুব চকচকে। এক নজরে এর বেশি কিছু দেখতে পেল না জয়ন্ত।

—'আপনার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে!'

—'ঠিক আছে খেয়ে নিচ্ছি' বলে কনুইয়ের ভর দিয়ে উঠে বসতে গেল জয়ন্ত। একটু আগেই সে ভেবেছিল শরীরের ব্যথা বেদনা কমে গেছে প্রায়, সেটা যে ভুল তা বুঝতে পারল।

ওর অসহায় যন্ত্রণা কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে মেয়েটা হেসে ফেলল, 'আরে আপনি উঠছেন কেন, আমি দিচ্ছি।'

খাটের পাশে ছোট্ট টেবিলটা থেকে এ্যালুমিনিয়ামের মোড়ক ছিঁড়ে একটা ক্যাপসুল আর জলের গ্লাসটা তুলে নিয়ে জয়ন্তর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। জয়ন্ত হাঁ করে ওষুধটা খেতে খেতে শুধুমাত্র মেয়েটির কপালে খয়েরী টিপ, ভ্রু আর চোখ জোড়া দেখতে পেল। কোথায় যেন পড়েছিল, তিন মাসের শিশুর কাছে তার মায়ের চেহারার ওইটুকুই শুধু পরিচিত, এর বাইরে সে দেখতে পায় না।

মেয়েটি চলে যাবার আগে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আমার নাম পাখি। আমার পরে ভাই রঞ্জু, তারপর বোন তিন্নি। এছাড়া আছে

মা, বাবা, দাদু। বামুনদি, আমাদের বাড়ির সকলের গার্জেন। আপনি যে কদিন আছেন, আপনারও।' বলেই মেয়েটা মিষ্টি করে হাসল।

জয়ন্ত বলল, 'আমি কাল পরশুই চলে যাব।'

—'কোথায় যাবেন?'

—'কলকাতায় না, পাহাড় টাহাড় সমুদ্র টমুদ্র—যা হোক কোথাও।'

—'ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট তো বিজ্ঞাপনই দেয় দার্জিলিংয়ের বর্ষার সজল রূপ দেখে যান।' মেয়েটি আবার হাসছে।

জয়ন্ত একটু অস্বস্তির মধ্যে পড়ল। তার এই বছর পঁচিশের জীবনে এখনো কোন বান্ধবী নেই। অনেকে আগ্রহ দেখিয়েছে। বাড়িতে, ক্লাব টেন্টে ফোন আসে। চিঠিও দু একটা। জয়ন্ত কোনদিনই এসব ব্যাপারে উৎসাহ দেখায়নি। এ মেয়েটা বড় কথায় কথায় হাসে, নাকি সব মেয়েই হাসে, কে জানে?

পাখি বলল, 'আপনি এখন চুপ করে শুয়ে থাকুন। একটু সুস্থ হলে তারপর জমিয়ে বসে গল্প করব।'

চলে যাচ্ছিল পাখি, জয়ন্ত পেছন থেকে ডাকল, 'শুনুন!'

'এই ছবিটা খুলে নিয়ে যাবেন?' বলে জয়ন্ত দেওয়ালে সাঁটা তার ছবিটার দিকে আঙুল দেখাল। পাখি দাঁড়িয়ে একটু ঠোঁট কামড়াল, তারপর অদ্ভুত একটা ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'না ওটা ওখানেই থাকবে।'

'না, আমার বিশ্রী লাগছে' জয়ন্ত চেঁচিয়ে উঠেই তারপর খুব আস্তে মিনতি করার সুরে বলল, বিশ্বাস করুন, আমার ছবিটা আমাকে ব্যঙ্গ করছে, বুকের ভেতর গরম লোহা চেপে ধরছে।'

পাখি এখন আর হাসছে না, 'অপরাধের শাস্তি পেতেই হয়, এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করাটা কাপুরুষতা।'

জয়ন্ত আরো কী সব বলতে গিয়ে চুপ করে গেল। এই মেয়েটা কে যে, তাকে নিজের কথা সাত কাহন করে বলতে হবে?

বাইরে তোড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। বালিশের তলা থেকে হাত ঘড়িটা নিয়ে দেখল সবে চারটে বেজেছে, কিন্তু যেভাবে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, মনে হয় রাত্রি হতে আর বেশি দেরী নেই। ঘরের মধ্যে ক্ষীণ

আলো, ক্রমাগত বৃষ্টির শব্দ, মশার ডাক, আর শরীরের অসুস্থতায় জয়ন্তর মনের মধ্যে চাপা বিষাদের ভাবটা আবার ঘুলিয়ে উঠল। অনেকদিন আগে ছোটবেলায় একবার পক্স হয়েছিল, তখন এরকম নিঃসঙ্গতার মধ্যে কেটেছে।

জয়ন্ত কষ্ট করে বিছানার ওপর ওঠে বসল, তারপর শরীরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রায় পুরোপুরি মনের জোরে হেঁটে বাথরুমে গেল। ফিরে এসে দেখল ঘরের মধ্যে একটা হ্যারিকেন বসানো রয়েছে, একজন মাঝ বয়সী মহিলা বিছানাটা ঝেড়েঝুড়ে ঠিক করছেন। জয়ন্ত খাটের কাছে দাঁড়াতেই ওকে ধরে উঠতে সাহায্য করল। জয়ন্ত বলল, 'আপনি ছোট্টুদার দিদি?'

—'হ্যাঁ সেজদি। কাল রাতে তো ঘাড় গোঁজ করে ছিলে, সকাল থেকেও আজ কতবার এলাম, তোমার সঙ্গে আলাপই হল না।'

—'আমি ঠিক সুস্থ ছিলাম না সেজদি।'

—'জানি। এখন কেমন আছো?'

—'ভালো। কাল পরশুর মধ্যেই চলে যেতে পারব।'

—'কোথায় যাবে?' ভদ্রমহিলা স্পষ্টতই অবাক।

—'দার্জিলিঙ—সেখানকার বর্ষার সজল রূপ দেখব।' একথাটাও জয়ন্ত কতটা সিরিয়াসলি বলল বোঝা গেল না, খুব অন্যমনস্কভাবে বৃষ্টির শব্দে কান রেখে কথা কটা ওর মুখ থেকে বেরোল।

—'তোমার জন্য আমার দুঃখ হয় জয়ন্ত—'

—'বিশ্বাস করুন সেজদি, আমি ইনোসেন্ট—গোলটা—'

—'জয়ন্ত চুপ কর, উত্তেজিত হয়ো না। কই দেখি তোমার ব্যথার জায়গাগুলো, একটু হাত বুলিয়ে দিই, আরাম লাগবে। ···কি হল? লজ্জা পাচ্ছ? আমি তোমার ছোট্টুদার সেজদি, আমার মত অনেক মেয়ের তোমার সমান ছেলে আছে···' বলে জোর করে জয়ন্তর শার্টটা তুলে তারপর হ্যারিকেনের আলোটা ফেলল। 'ঈস! এভাবে কেউ কাউকে মারে?'

—'ওরা আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল।'

এমন সময় হৈ চৈ করতে করতে কে একজন লম্বা টানা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে এল। 'বৌমা, তুমি এখানে? —আমাদের প্লেয়ার কেমন আছে?' টান টান চেহারার এক বৃদ্ধ ঘরে ঢুকল। 'ব্যাটারা খুব ঠেঙিয়েছে। ইয়েস মিস্টার প্লেয়ার···! সাইড বাই সাইড হোমিও-প্যাথি ট্রিটমেণ্ট চলবে নাকি? —আচ্ছা আমাদের জুনিয়ার প্লেয়ার কোথায়? তাকে একটু কম দেখা যাচ্ছে মনে হয়?'

—'রঞ্জুর কথা বলবেন না। বৃষ্টি বলে বাইরে বেরোতেও পারেনি, ঘর থেকে পর্যন্ত বেরোচ্ছে না। ওর মাথায় পোকা আছে!'

—'মাথায় না দাঁতে পোকা আছে রঞ্জুর' বলে ভদ্রলোক খুব হাসতে লাগলেন। 'আমি রঞ্জুর দাদু। হেড অব দ্য ফ্যামিলি। আমার নাম হাবুলদা। পাড়া শুদ্ধ সব বয়সের সব লোকের হাবুলদা—রেগে গেলে কেউ হ্যাবলা বলেও তাচ্ছিল্য করে।'

—'বাবা, আপনারা গল্প করুন, আমি রান্না ঘরের দিকে যাই।'

—'বৌমা, ছেলেমেয়েগুলোকে আজ 'রেনি-ডে'র ছুটি দিয়ে দাও না, আজ সবাই মিলে একটু গল্প গুজব করি।'

জয়ন্ত পাশ ফিরে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুলো। এত সব কিছু ভাল লাগছে না জয়ন্তর। ওর ইচ্ছে করল রঞ্জু নামে ছেলেটার মুখোমুখি হতে। তারপর সে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। জয়ন্ত অপেক্ষা করে রইল কখন 'হাবুলদা' ঘর ছেড়ে গিয়ে তাকে একলা থাকতে দেবেন।



জয়ন্ত এখন একটু ভাল আছে। জ্বরটা নেই, গায়ের ব্যথাও অনেকটা কম, তবে পুরোপুরি সুস্থ নয়। জয়ন্তর মনে হচ্ছে, আর এই অনাত্মীয় অপরিচিতের বাড়িতে থাকাটা ভাল নয়।

এখান থেকে বেরিয়ে প্রথমে বাড়ি যাবে। টেনশনটা এখন নিশ্চয়

কমেছে। জয়ন্তকে দেখলে কিছু ছুটকো ছাট্‌কা টিটকিরি দেবে, এর বেশি আর কি হবে? বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে অন্তত মাস খানেকের জন্য কোথাও বেড়াতে যাবে। জয়ন্ত এই মুহূর্তে মনে ভেবে ঠিক করেছে রাঁচির দিকে যাওয়া যেতে পারে। ওখানে মেজমামা আছে। মেজমামার কথা মনে হতেই, রাঁচির বাড়ির পাড় বাঁধানো বিরাট ইঁদারা আর তার লাগোয়া জ্যাকারাণ্ডা ফুল গাছটার কথা মনে পড়ল। বসন্তে ফোটা বেগুনী ফুলগুলো কি সব ঝরে গেছে এতদিনে?

ছোট্টুদা নিজে আর এখানে আসতে পারেনি, তবে লোক মারফৎ জয়ন্তর জামাকাপড় আর কাজে লাগবে এমন টুকটাক জিনিস ভর্তি করে একটা ব্যাগ পাঠিয়ে দিয়েছে। জয়ন্ত ব্যাগ হাতড়ে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম বের করে, জানলার কাছে ছোট্ট আয়নাটা লাগিয়ে পরিপাটি করে দাড়ি কামাল। আয়না দিয়ে খুঁটিয়ে দেখল নিজের মুখটা, কেমন একটা ভয় পাওয়া ক্রিমিন্যালের মত, মানে সিনেমার অভিনেতাদের এ অবস্থায় যেমন দেখা যায়, তেমনি একটা মুখের ভাব। যা দেখে জয়ন্ত বিন্দুমাত্র খুশী হল না।

দাড়ি কামানোর জিনিসগুলো ধুতে জয়ন্ত নিজেই কুয়োতলায় চলে গেল। সেখানে তিন্নি ভাত খাওয়ার পর আঁচাচ্ছিল। স্কুলে যাবে সে। জয়ন্তকে একটু বিব্রত মুখে উঠোন পেরিয়ে আসতে দেখে তিন্নি হাততালি দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল। মেয়েটা আচ্ছা ফোক্কর। বছর বারোর বেশি বয়স না। কিন্তু কথাবার্তা যা বলবে একেবারে পাকা ঠানদি। মেয়েটাকে ভাল লাগে জয়ন্তর। বর্ষার জল পেয়ে মাটি ফুঁড়ে গজানো উদ্ভিদের মত স্বাভাবিক ও সতেজ ওর উপস্থিতি।

জয়ন্ত ওর হাতের জিনিসপত্র কুয়োর পাড়ে নামিয়ে রেখে রুখে দাঁড়াল, 'হাসছো কেন?' এ কথায় মেয়েটা একেবারে পাহাড়ী ঝর্ণা হয়ে গেল। হাসির দমকে সারা শরীর ঢেউ খেলিয়ে কাঁপছে। জয়ন্ত এবার স্পষ্টতই বিরক্ত বোধ করল। বেশ ধমক দেবার মত করে বলল, 'তিন্নি'!

—আমি কী করব, আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল—তাই হি-হি-হি—বিশ্বাস করুন হাসি চাপতে পারছি না। আই অ্যাম হেল্পলেস।'

তারপর খানিকটা করুণা করেই হয়ত জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে হাসি থামিয়ে বলল, 'আমাদের পাশের বাড়ির মিত্তির মাসীমাকে চেনেন ?'

—'আমি কী করে চিনবো ?'

—'ধ্যাৎ ! সেতো আপনাকে চেনে।' জয়ন্তর বলতে ইচ্ছে করছিল আমাকে তো অসংখ্য লোক চেনে, কিন্তু মেয়েটা আবার কথাটাকে কোনদিকে ঘুরিয়ে দেয়, বুকের মধ্যে অনুশোচনার ঘা-টা এখনো দগদগ করছে। একটু বেসামাল হলেই খোঁচা লেগে বিপর্যয় ঘটতে পারে।

—'যাই হোক আপনি চেনেন না মিত্তির মাসীমাকে। মা তো খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল আপনি বোধহয় মরে যাবেন…' 'মরে যাবেন' কথাটা বলার আগে একবার কপালে হাত ছুঁইয়ে নিল।

—'ধ্যাৎ যতসব বাড়িয়ে কথাবার্তা বলছ।'

—'বিলিভ মি—গড প্রমিস—আপনি এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন ! মাঝে মাঝে ভাল হচ্ছেন দিব্যি কথা-টথা বলছেন·· তারপর আবার হু হু করে জ্বর আসছে, চোখ টোখ উল্টে···জানেন স্যার, এই আপনার ওপর আমার এত মায়া হল, মা মঙ্গলীতলার কালীবাড়ি পুজো দিতে যাচ্ছিল দেখে আমিও সঙ্গে গেলাম। আমার মা আপনার কথা বলে মাকালীর কাছে কত কান্নাকাটি করল।'

—'যাঃ, দিদি আমার জন্য কাঁদল ?'

—'মা সবার জন্যে কাঁদে। মার মনটা খুব নরম। আমি একবার ভুলু কুকুরকে শুধু শুধু বেদম পিটিয়েছিলাম বলে মা ভুলুর দুঃখে আমার খাওয়া বন্ধ করে শাস্তি দিল, আমি উপোস করে আছি দেখে আমার দুঃখে মা নিজে না খেয়ে রইল, মা খাচ্ছে না দেখে বামুনদি সব ভাতে জল ঢেলে, হাঁড়ি তুলে রেখে নিজের ঘরে বসে রামায়ণ পড়তে লাগলেন। সন্ধ্যেবেলা সেসব ভাত-তরকারি একা ভুলুকে ডেকে খাওয়ানো হল।'

দুঃখ বোধের এই চেন রিঅ্যাকশন দেখে জয়ন্তর হাসি পেল। জয়ন্ত বলল, 'তুমি কিন্তু শুরু করেছিলে মিত্তির মাসীমার কথা দিয়ে।'

—'ও, মাসীমা মার মন খারাপ দেখে বলল, ভাইব্যোন না দিদি পেলেয়ারদের হইল কাউঠ্যার প্রাণ, অরা খেলতে গিয়া মাইর খাইয়া

মাঝে মাঝেই মর মর হয়—দুইদিন ঘাপটি দিয়া পইর্‍্যা থাকে, আবার একদিন ঝাড়াখাড়া দিয়া ওঠে।' এবার তিন্নির সঙ্গে জয়ন্তও প্রাণ খুলে হাসল। ঠিকই তো বলেছে তোমার মাসীমা। কাছিমের প্রাণ না হলে কি আর বেঁচে উঠতাম?'

ওদের দু'জনের কথা এখানে এসেই থেমে গেল। স্কুল ড্রেস পরা হাতে বই খাতা, রঞ্জু প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের লোকের গাম্ভীর্য নিয়ে ওদের সামনে দিয়ে চলে গেল। ও চলে যেতেই তিন্নি আবার হাসি শুরু করল। 'দাদাটা এক্কেবারে যা-তা। কবে কী হয়েছে, স্টিল মনে রেখেছে। আপনার ধারে কাছে ঘেঁষে না দেখবেন। আমি বললাম জয়ন্তদার সঙ্গে কথা বলিসনা কেন রে? ও গম্ভীর হয়ে মোটা গলায় বলল 'আই হেট হিম'। এখনো ভাল করে গোঁফের রেখা দেখা গেল না, কথা বলবে পাকা ঠাকুরদার মত।' তিন্নির মুখটা দেখে মনে হল ও সত্যিই রঞ্জুর ওপর বিরক্ত।

জয়ন্ত একটু ভারী গলায় বলল, 'তিন্নি, আমি তো এখন ভাল হয়ে গেছি, আজ বিকেলে চলে যাব।'

—'না!' অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে তিন্নি এর বেশি আর কিছু বলতে পারল না। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, 'কেন চলে যাবেন? এখানে আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে?'

—'তুমি বুঝবে না তিন্নি, তুমি খুব বাচ্চা মেয়ে।'

—'আমার বোঝার দরকার নেই। --কাল দিদির জন্মদিন দিদির জন্মদিনটাই এ বাড়িতে সবচেয়ে ঘটা করে হয়। চলে গেলে নেমন্তন্নটা আপনিই মিস করবেন। আমাদের কী? আপনি তো এখন ভাল হয়ে গেছেন, মা আর আপনার জন্য কাঁদবে না।'

জয়ন্ত দেখল মায়ের আগেই তার ছোট মেয়ে কেঁদে ফেলেছে অবাক হল জয়ন্ত, সে চলে যাবে বলে তিন্নি দুঃখ পাচ্ছে কেন ভেবে? জয়ন্ত ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে ডাকল 'তিন্নি—।'

—'আমার স্কুলের দেরি হয়ে যাবে, আমি যাই—!' বলে এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে তিন্নি দ্রুত চলে গেল ঘরের দিকে।

একা কুয়োতলায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল জয়ন্ত। বৃষ্টি নেই, তবে আকাশে মেঘ আছে। ফাঁক দিয়ে দিয়ে যেটুকু রোদ গায়ে এসে পড়ছে, তাতে বড় জ্বালা। জয়ন্ত কুয়োর স্যাঁতসেঁতে পাঁচিলটায় হেলান দিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎই মনে পড়ে গেছে, এভাবে কুয়োর দড়ি ধরে বালতিটা নিচে নামাতে লাগল। দাড়ি কামাবার সরঞ্জামগুলো ধুয়ে সে এবার ঘরে যাবে।

জয়ন্ত বিকেলে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে এটা ঠিক করেই রেখে-ছিল। ভেবেছিল, যাবো বললেই চলে যাওয়া যাবে, এক্ষেত্রে কোন পিছুটানের প্রশ্ন থাকবে না। কিন্তু ব্যাপারটা তার কাছে আশ্চর্য মনে হচ্ছে, এ বাড়িতে সজ্ঞানে অজ্ঞানে কয়েকটা দিন কাটানোর মধ্যে কী এমন ঘটনা ঘটেছে, যার জন্য চলে যাওয়াটা যতটা সহজ ভাবা গিয়ে-ছিল, তা হচ্ছে না। তিন্নি তার যাওয়ার কথা শুনে প্রথমে চমকে উঠেছিল, পরে অভিমানে চোখে জল এসে গিয়েছিল তার। ছোট্টুদার সেজদি তার জন্য কালী ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানাতে গিয়ে কেঁদেছে-- সবকিছুই জয়ন্তর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। সে মনে মনে ভাবল তার কাছে যদি কেউ এভাবে এসে আশ্রয় নিত, তবে কি তারও চোখে জল আসত ?

জয়ন্ত পা বাড়িয়েই ছিল। কিন্তু এভাবে যে বাধা আসবে ভাবতে পারেনি। ও পায়ে পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ভেজা পূবের বাতাস বইছে। আকাশটা কার্বন পেপারের কালি না লাগানো দিকটার মত, ফ্যাকাশে কালো। রোদ নেই। জয়ন্ত বাগানে গিয়ে দাঁড়াল। বাগানের মাটিটা ভেজা স্যাঁতসেঁতে। লতানো জুঁই গাছটা ফুলে ফুলে সাদা হয়ে রয়েছে। ফুলের গন্ধটা তীব্রভাবে পাওয়া যায় সন্ধ্যে-বেলা। জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে কিছু ফুল নাকের কাছে ধরতে গিয়ে সরিয়ে নিল। ফুলটা কাউকে দেওয়া যেত। কাল পাখির জন্মদিন।

পাখির কথা ভেবে হাসি পেল জয়ন্তর। একদিন এসে আলাপ করেছিল নিজে থেকেই ; তারপর থেকে সে যে বাড়িতে আছে সেটাই টের পাওয়া যায়না। তবে জয়ন্ত তার উপস্থিতিটা টের পায় অন্য-

ভাবে। একটু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বাথরুম বা অন্য কোথাও গেলেই, এসে দেখতে পায় বিছানাটা টান করে পাতা, জিনিসপত্রগুলো ঝাড়া মোছা। সেদিনকার খবরের কাগজটা হাতের কাছে রাখা। এতদিন তো জয়ন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কতটুকুর জন্যই বা বাইরে যেতে পারত, কিন্তু তার মধ্যেই এসব যত্নের ছাপ ঘরে ফুটে উঠত। জয়ন্তকে জীবনে এই প্রথম কেউ একজন লজ্জা পাচ্ছে দেখে, জয়ন্ত নিজেও খুব লজ্জা পেল।

এরপর জয়ন্ত ঘরের ভেতর এসে অলস ভঙ্গিতে একবার হাই তুলল তারপর হাঁটি হাঁটি পায়ে দেওয়ালে সাঁটা ওর ছবিটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। যেন আয়নায় নিজেকে দেখছে, এইভাবে ওই রঙীন ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। 'হ্যাল্লো জয়ন্ত! ফুটবল খেলা টেলা কেমন চলছে? বলে আলতো করে কিন্তু রাগ আর ঘেন্না মেশানো ঘুঁসি ছবিটার ওপর মারল। অনায়াসেই ছবিটা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলা যেত! জয়ন্ত পাখির কথা মনে পড়ল, অপরাধ যখন করেছে শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

বেচুদা ত মালদার রেল মাঠে প্র্যাকটিসের প্রথম দিনেই বলে দিয়েছিল, 'চেষ্টা করে ঘষে মেজে কিছুটা হয়ত দাঁড় করান যাবে, তবে ব্যাপারটা অনিশ্চিত। তার চেয়ে মন দিয়ে লেখাপড়া শেখো, ছেলে বি এ পাশ, টাইপ শর্টহ্যাণ্ড জানে! একে ওকে ধরাধরি, এদিক ওদিক দু চারটে অ্যাপ্লিকেশন; পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের দু'একটা পরীক্ষায় অ্যাপিয়ার হওয়া; একসময় চাকরির কোন একটা শিকা খানিকটা দৈবাৎ ভাবে বেড়ালের ভাগ্যে ছিঁড়ে পড়া; চুকে গেল ল্যাঠা। সিধে রাস্তায় জীবন। কী হবে ফুটবল শিখে? কটা প্লেয়ার তালেবর হয়? চুনী, বলরাম, জার্নাইল সিং শুনতে ভাবতেই ভাল লাগে নামগুলো। হাজার হাজার ছেলে খেলা শিখছে, ক'জন পৌঁছয় সেখানে?'

তখন বেচুদার কথায় পিছিয়ে এলে জীবনটা নিশ্চয়ই আজ অন্য-রকম হত। যাক্‌গে, এখন আর ওসব ভেবে কী হবে? জয়ন্ত বিরাট করে একটা হাই তুলে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল তিন্নির চেঁচামেচিতে। 'ইউ লেজি বোনস গেট আপ।' জয়ন্ত দেখল একটা হাত পেছন দিকে আড়াল করে কী যেন ধরে রেখেছে তিন্নি। তিন্নি স্কুল থেকে এসেছে, মানে বিকেল হয়ে গেছে পুরোপুরি। হাতটা পেছনে রেখেই তিন্নি ওর গা ঘেঁষে বসল, 'আজ কটা শালিখ দেখেছেন, একটা-ছুটো—না তিনটে ? ওর প্রশ্নের ধরনে জয়ন্ত অবাক হল। 'কী জানি কটা শালিখ দেখেছি ? আদৌ দেখেছি কিনা কী করে বলব ?' তিন্নি হাসতে হাসতে বলল, 'ওয়ান ফর সরো, টু ফর জয়। থি্র ফর লেটার, ফোর ফর টয়। আপনি আজ নির্ঘাৎ তিনটে শালিখ দেখেছেন, আপনার একটা চিঠি এসেছে।' বলেই পেছনে রাখা হাতটা ম্যাজিসিয়ানের মত বোঁ করে সামনে নিয়ে এল। চিঠির কথা শুনেই জয়ন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিল। ও জানত চিঠি এলে বাড়ি থেকেই এসেছে। ছোট বোন রুমার চিঠি।

'দাদা, ছোট্টুদার কাছে তোর ঠিকানা পেলাম। তুই কেমন আছিস মা খালি কাঁদছে। তুই সামান্য একটু সুস্থ হলেই চিঠি দিবি। ছোট্টুদা অবশ্যি বলে গেছে, তোর শরীর নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। যেখানে আছিস নিরাপদেই আছিস। তবু তো চিন্তা না করে থাকা যায় না। মা'র প্রেসার মাঝে খুব বেড়েছিল। এখন একটু সামাল দেওয়া গেছে। সে কি কাণ্ড, মা শয্যাশায়ী। ডক্টর সেনকে ফোন করার চেষ্টা হল, ওর ফোনটা খারাপ। ছু'পা হেঁটে গিয়ে যে একটু খবর দেব, তারও উপায় নেই ; বাড়ির বাইরে তোদের ক্লাবের সাপোর্টাররা তখন তাণ্ডব করছে। বাবা বা ছোড়দা কেউই সে অবস্থায় বোরোতে সাহস পাচ্ছিল না। তুই এখন ঠিক কী অবস্থায় আছিস জানিনা.তোকে এসব লিখতে আমার খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু না লিখেও তো পারছি না। প্র্যাকটিকালি বাড়ি শুদ্ধ লোক আমরা জেলখানায় আটকে রয়েছি। আজ চারদিনে পড়ল, তবু উত্তেজনা একটুও কমেনি। টেলিফোন ধরতে ভয় লাগছে—টেলিফোন তুললেই এমন সব কথা কানে আসছে,রাগে অপমানে গা হাত পা রি রি করে উঠছে। বাড়ির বাইরে অশ্লীল চিৎকারে কান পাতা দায়। দাদা, আমরাও যদি তোর মত কোন অজ্ঞাতবাসে যেতে পারতাম ? ..'

চিঠিটা পড়ে জয়ন্ত মাথা নিচু করে জড় পদার্থের মত নিশ্চল হয়ে রইল। এ মুহূর্তে কোন বোধ বুদ্ধি কাজ করছে না। অনেকক্ষণ বাদে ধীরে ধীরে চেতনাটা ফিরে এল। আর সে সময় ওর চোখের উপর একটা ছবি ভেসে উঠল। জয়ন্ত ভাবল অপোনেণ্ট টিমের গোল-কিপার বলটা হাতে নিয়ে অল্প জোরে পেনাল্টি বক্সের মাথায় লেফট হাফকে দিল। লেফট হাফ বল নিয়ে কয়েক পা এগোতেই জয়ন্তর দলের রাইট স্ট্রাইকার যোগো বল কেড়ে নেবার জন্য এগোল, ওদের সেণ্টার হাফ এসে যোগোকে আটকাল ; ততক্ষণে লেফট হাফ পুশ করে বল প্রায় মাঝমাঠে বাড়িয়ে দিয়েছে, সেখান থেকে ওদের লেফট স্ট্রাইকার সেণ্টার লাইনের মাঝ বরাবর এসে বলটা ডান দিকে ফ্লিক করল। লেফট আউট বলটা ধরে তির্যক ভঙ্গিতে জয়ন্তদের রাইট হাফকে ফাঁকি দিয়ে পুশ করল আগুয়ান লেফট স্ট্রাইকারকে, বল ধরে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ভাবে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে ক্রস পাশ করল রাইট আউটের দিকে। তার আগেই জয়ন্ত তৎপর হয়েছে। আক্রমণটা খুব দ্রুত আর সুচারু ভঙ্গিতে হয়েছিল, তাই লেফট স্ট্রাইকার যখন থ্রু পাশ করল তখন জয়ন্ত প্রায় গোল এরিয়ায় দঁড়িয়ে। জয়ন্তর পেছনে গোলী সোমনাথ, সামনে ছুটে আসছে রাইট আউট। বলটা আগে জয়ন্তেরই পাওয়ার কথা। বল মেরে বিপদ সীমার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়াটা কিছু কষ্টকর ছিলনা ওর পক্ষে। জয়ন্ত মুহূর্তের জন্য ভেবেছিল, বলটা ধরে ওদের রাইট আউটকে ফাঁকি দিয়ে এগিয়ে যাওয়াটা অসম্ভব হবে না। একেবারে মেরে বের করে দেবার চেয়ে ফাঁকায় দাঁড়ানো রাইট হাফকে বলটা ঠেলতে পারলে ভাল হবে। আসলে এ চিন্তাগুলো এত সুবিন্যস্তভাবে তখন হয়নি। তবে ভেবেছিল সে। কিন্তু বলটা রিসিভ করার আগেই ও দেখল অপোনেণ্ট টিমের রাইট আউটের পাটাও বলের নাগালে একটু হলে পৌঁছে যায়।

জয়ন্ত বেপরোয়াভাবে ডান পা-টা বলের ওপর চালাল। মাঠ ভেজা ছিল। সেকেণ্ড হাফের খেলার সময়টাও ফুরিয়ে আসছিল। অতক্ষণ খেলায় বুটের চাপে কাদা ভাবটা বেড়ে গিয়েছিল। জয়ন্তর নন-কিকিং পা-টা যাওয়ার কথা নয়, তাও একটু পিছলে গেল, বেসামাল

হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ার আগে ওর ডান পায়ের বাইরের দিকে বলটা লেগে…। থ্যু, পাশটা আস্তে ছিল না, তার ওপর বাঁ পা-টা পিছলে যাওয়ায় ডান পা-টা বিচিত্র ভাবে আন্দোলিত হয়েছিল। বলটা বুলেটের মত দ্বিতীয় পোস্টের ধার ঘেঁষে ভেতরে ঢুকে গেল। সৌম্যেন শেষ মুহূর্তে বিপদ বুঝে লম্বা শরীরটাকে প্রাণপণে ছুঁড়ে দিয়েছিল, কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে।

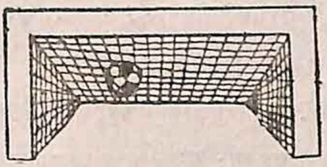
এটা ভুল, না দুর্ঘটনা? জয়ন্তর দলের সাপোর্টাররা এটাকে ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা। সেই গোলে জয়ন্তর ভূমিকার ব্যাখ্যা যাই হোক, তার জন্য মার ব্লাড প্রেশার বেড়েছে, ডাক্তার ডাকা যাচ্ছে না, বাড়ি চড়াও হয়ে উত্তেজিত সমর্থকদের তাণ্ডব চলছে, সে নিজে অন্য জায়গায় গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে।

জয়ন্ত মাথার ভেতরটায় কেমন এক ভারহীন শূন্যতা অনুভব করছে। মস্তিষ্কের অনুভূতি কেন্দ্রগুলো যেন ভোঁতা হয়ে পড়েছে। জয়ন্ত রুমার চিঠিটা হাতে করে অনেক্ষণ বসে রইল, ঘরের মধ্যে ততক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। আলো দিতে এসে পাখি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ জয়ন্তর দিকে। পাখি ঘর থেকে বোরোবার সময় দরজার একটা পাল্লা ধাক্কা লেগে সজোরে বন্ধ হওয়ার শব্দে চমক ভাঙল জয়ন্তর। বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে ও যেন নিজেকে ফিরে পেল। হাতের মুঠোর মধ্যে চিঠিটা কখন যেন দলা পাকিয়ে গেছে। সেটা খুলে টান টান করতে করতে জয়ন্ত খুব অস্পষ্ট উচ্চারণে বলল, 'রুমা, তুই আমাকে ক্ষমা কর, এই সব কিছুর জন্য আমি দায়ী।'

উৎস মুখটা এবার সত্যি সত্যি খুলেছে। জয়ন্তর মনের মধ্যে তীব্র আবেগের বিরাট ভারী স্তূপটা কান্না হয়ে গলে পড়ছে। বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে জয়ন্ত একসময় নিজেকে অনেকটা হাল্কা মনে করল।

সে রাতে জয়ন্তকে কেউ আর বিরক্ত করেনি। খেতে ডাকলেই যে জয়ন্ত উঠে বসবে, একথা কেউ ভাবেনি। নিঃশব্দে খাবারটা ঢেকে রেখে গিয়েছিল কে যেন। জয়ন্ত তার দিকে ফিরেও তাকায়নি।

রাতে যখন একবার ঘুম ভাঙল জয়ন্তর, তখন ঘরের হ্যারিকেনটা খুব মৃদু হয়ে জ্বলছে। রাত কত কে জানে? বাড়ির সবাই শুয়ে পড়েছে। জয়ন্তর মনে হল তার নিঃশ্বাসটা গরম। সারা দেহটা খুব হাল্কা লাগছে, বুঝল আবার তার জ্বর আসছে।



গত শনিবারের পর থেকে সুরঞ্জন আর মাঠে নামেনি। তারপর প্রায় সাতদিন ধারে টানা বৃষ্টি চলেছে, এটা একটা কারণ। দ্বিতীয় আর প্রধান কারণটা হল সুরঞ্জন মাঠে যাওয়ার উৎসাহ পাচ্ছিল না।

সুরঞ্জন জানে জয়ন্ত মিত্রের তাদের বাড়িতে থাকার কথাটা পাড়ায় যত কম চাউর হয় ততই ভাল। দু' একজন কানা ঘুঁষোয় কিছু জেনেছে, খেলার মাঠে সুরঞ্জনকে পেলেই ছেঁকে ধরবে। মাঠে যাওয়ায় সুরঞ্জনের তাই এত কিন্তু কিন্তু ভাব।

মিত্তির মাসীমার বাড়ির পেছন দিককার পাঁচিল ঘেরা আমবাগানটা খুব ভাল। বাইরে থেকে একদম আলাদা। চার পাশে লাইন করা আমগাছ, মাঝখানটা ফাঁকা। ফাঁকা জায়গায় আগে হলুদ চাষ হত। বহুদিন সে সব বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝখানে এখন ঘাস জমি, তবে একটু উঁচু নিচু।

বাগানের বেশির ভাগ জায়গাতেই ঘাসের তলায় জল ছপ্ ছপ্ করছে। মাঝখানটা উঁচু বলে জল জমে নেই। সুরঞ্জন সেখানে একটা জায়গা ফুটবল মাঠের সেণ্টার সার্কেল হিসাবে কল্পনা করে বলটা নিয়ে পায়ের পাতার ভেতর দিকটা দিয়ে ড্রিবল করতে করতে ক্লক ওয়াইজ ধীরে ধীরে ঘুরতে লাগল। ক্রমে বৃত্তের পরিধি ও গতিবেগ বাড়ল। একসময় থেমে পায়ের পাতার বাইরের দিক দিয়ে বলটা ঠেলতে ঠেলতে আঁকাবাঁকা গতিতে বৃত্তাকারে ঘোরা শুরু করল, তবে এবার অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ আর বৃত্তের পরিধি ক্রমে কমছে।

সকাল থেকেই গুমোট গরম ছিল, তার ওপর এই পরিশ্রমে ঘামে গা ভিজে গেছে। সামনের লম্বা চুল কপালের ওপর এসে লেপটে রয়েছে। সুরঞ্জন বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁ পায়ের চেটো দিয়ে বলটা তুলে ভলি করল--এক, দুই, তিন—একবারও বলটা মাটি ছোঁয়নি —চার নম্বর ভলিটা করল জোরে উঁচু করে, ফিরতি পথে বলটা ট্র্যাপ করল। এমন বারকয়েক করার পরই সুরঞ্জন হঠাৎ দেখল বাগানে ঢোকার মুখে মাধবী লতার ঝোপের কাছটায় জয়ন্ত দাঁড়িয়ে। একটা নেভি ব্লু সার্ট, সাদা প্যান্ট, পায়ে চপ্পল ; সুরঞ্জনকে লক্ষ্য করছে। সুরঞ্জন বুঝতে পারল বলে ছোঁয়াবার জন্য জয়ন্তর এখন নিশ্চয় পা নিশপিশ করছে। সে কথাটা ভেবেই ও বলটা নিয়ে আর একটু দূরে সরে গেল।

জয়ন্ত খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। সুরঞ্জন আর একটু পিছিয়ে এল, এখানটায় ঘাসের তলায় বেশ জল। জয়ন্তর দিকে নজর রাখার জন্যই সুরঞ্জনের বল কনট্রোলে গোলমাল হয়ে গেল। টো-এর ধাক্কায় বলটা হঠাৎ ছোট্ট একটা কার্ভ করে সামনের দিকে এগিয়ে এল সুরঞ্জন ছুটে গিয়ে ধরার আগেই জয়ন্ত এসে বলটার দখল নিয়ে নিল।

জয়ন্ত বলের ওপর ডান পাটা লাগিয়ে একটু ঝুঁকে রয়েছে। ও আশা করছে সুরঞ্জন বল কেড়ে নিতে আসবে। একটু ইতস্তত করে সুরঞ্জন এগোল। ডান পাটা বাড়ানোর আগেই জয়ন্ত বলটাকে পায়ের ছোট্ট টোকায় ইঞ্চি চারেক সরিয়ে নিয়েছে ডান দিকে। সুরঞ্জন এবার ডান পায়ে ভর দিয়ে বাঁ পা-টা তোলামাত্র, শরীরের চমৎকার এক দুলুনিতে জয়ন্ত বলটাকে বাঁ দিকে প্রায় হাতখানেক সরিয়ে আনল। সুরঞ্জন তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সুরঞ্জন উঠে আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। বলটা নিয়ে পা দিয়ে যেন জাগলিং করছে। জয়ন্তর দুটো পা অন্তত গোটা আটেক হয়ে গেছে। সুরঞ্জন বলটা পাবার জন্যে এলোপাথাড়ি পা বাড়াচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই নাগাল পাচ্ছে না। জয়ন্ত বলটা নিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে, শরীর দুলিয়ে এক অদ্ভুত কাণ্ড করছে, যার সঙ্গে সুরঞ্জন কোনোভাবেই পরিচিত নয়।

দু'জন খেলোয়াড়েরই মুখের ভাব খুব গম্ভীর। বাইরে থেকে দেখলে

যে কেউ মনে করবে, দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বুঝি শেষ রণে নেমেছে। সুরঞ্জন আর একবার আছাড় খেয়ে খুব রেগে গেল। ও ছুটে জয়ন্তকে ধরতে গিয়ে যখন দেখল জয়ন্তর শরীরটা ওর নাগালের মধ্য থেকে পিছলে যাচ্ছে, ও মরিয়া হয়ে জয়ন্তর সার্টটা টেনে ধরল। রাগের মাথায় মানুষ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উল্টো কাজ করে, সুরঞ্জন ডান পা দিয়ে বেশ জোরে জয়ন্তর থাই-এর পেছন দিকে লাথি মারল। জয়ন্তর পক্ষে লাথিটা বেশ জোরে হয়েছে। ও মাটিতে পড়ে মুখ নিচু করে দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা হজম করার চেষ্টা করল। সেটা সহজে হল না। জয়ন্ত মাটিতে পড়ে আছে। বলটা একটু দূরে গড়িয়ে গিয়ে থেমেছে। সুরঞ্জন হাত কয়েক তফাতে কোমরে হাত দিয়ে ডান পাটা সামান্য ফাঁক করে দাঁড়িয়ে।

জয়ন্তকে এভাবে মে র সুরঞ্জন নিজেও মোটে খুশী হয়নি। এমন একটা দুর্মতি হবার জন্য নিজের ওপরই নিজের রাগ হচ্ছিল। তারপর জয়ন্ত যখন উঠে দাঁড়িয়ে সুরঞ্জনের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বলল, অত সহজেই ফুটবলাররা হেরে যায়?' তখন সুরঞ্জনের লজ্জায় মাটিতে মিশে যাবার অবস্থা।

জয়ন্ত প্যাণ্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'তোমরা বন্ধু-বান্ধবরা এই মাঠে প্র্যাকটিস কর?' একটু থেমে বলল, 'বারপোস্ট কই?'

সুরঞ্জন বেশ সহজভাবেই উত্তর দিল, 'না, আমরা কোর্টের মাঠে খেলি। এখানে আমি মাঝে মাঝে একা প্র্যাকটিস করি।'

—'কোন পজিশনে খেল?'

—'লিঙ্কম্যান। রাইট আউটেও খেলি।'

—'স্টিভ ব্লুমার-এর নাম শুনেছ?' খুব ভালো সেণ্টার ফরোয়ার্ড ছিলেন।' বলতে বলতে জয়ন্ত বাগানের পূব দিকের দেওয়ালের কাছে চলে গেল। পরপর দুটো আম গাছের মধ্যে এখানে অনেকটা ফাঁক। আট গজের কাছাকাছি হবে। জয়ন্ত বলল, 'এখানে দেওয়ালে একটা গোলের ছবি এঁকে নিও। স্টিভ ব্লুমার দেওয়ালের গায়ে গোলের ছবি

এঁকে গোলটাকে ছ'টা সমান আয়তক্ষেত্রে ভাগ করে নিয়ে এক তুই করে ছয় পর্যন্ত নম্বর দিয়ে দিতেন। তারপর এক একটা নম্বরের ঘর লক্ষ্য করে বল মারতেন।'

সুরঞ্জন বলল, 'ব্যাপারটা আমি জানি। বইতে পড়েছি। এখানে খুব একটা আসা হয় না বলে, এসব করা হয়নি। ভেবেছিলাম করব।'

জয়ন্ত বলল, 'আমি এবার বাড়ি যাব। তুমি কি আরো থাকবে?'

—'না, আমিও ফিরব। খিদে পেয়ে গেছে খুব।'

—'কাল রাতেও আমার জ্বর জ্বর ভাব হয়েছিল, আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই ঠিক করেছিলাম একটু বাইরে বেড়িয়ে আসব। ঘরে এক জায়গায় স্থির হয়ে আছি বলে শরীরের সুস্থতা ফিরছে না। জামা প্যাণ্ট পরে তৈরি হচ্ছি, দেখলাম বল নিয়ে তুমি এদিকে বেরোলে। একটু খোঁজ করতেই তোমাকে পেয়ে গেলাম।'

ওরা খুব ধীর পায়ে বাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটছিল। এরপর আর ওদের তু'জনের মধ্যে কথা হল না। জয়ন্ত হঠাৎই খুব গম্ভীর হয়ে গেল। একটা গাছের ডালে বসে সাদা কালো রঙের দোয়েল শিস্ দিচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে জয়ন্ত একবার শুধু আপন মনে বলল, 'ভারী ভালো তো!'

পেছনের খিড়কি দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকেই সুরঞ্জন একেবারে ছোট-মামার মুখোমুখি হয়ে গেল। 'ছোটমামা তুমি এত সকাল সকাল পৌঁছে গেছ?'

—হ্যাঁ রে কাল রাতে অধেকটা পথ এগিয়েছিলাম, এক বন্ধুর বাড়ি। আজ সকালে একেবারে ফার্স্ট বাসে চলে এসেছি।'

জয়ন্ত একটু পিছিয়ে পড়েছিল, বাড়ির চৌহদ্দিতে ঢুকেই ছোট্টুদার দেখা পেয়ে আকুল হয়ে এগিয়ে গেল, 'কলকাতার খবর কী? কাল রুমার চিঠি পেয়েছি...।' প্রবল উৎকণ্ঠায় জয়ন্ত এর বেশি কিছু বলতে পারল না।

ছোট্টুদা গম্ভীরভাবে বলল, 'খবর খুব একটা ভালো নয়। বাড়ির মেয়েদের পরশু রাতে অন্য জায়গায় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাঁচির

ওদিকে তোর কে এক মামা থাকে না,সেখানে চলে গেছে ওরা। বাড়িতে তোর বাবা আর ভাই রয়েছে। আমার চেনা বিশেষ অনুগত দুটো জোয়ান ছেলেকে রেখেছি পাহারার জন্য। ওদিকে আর কোন ঝামেলার আশঙ্কা নেই। তবে এখনও টেনশন রয়েছে।' একটু থেমে ছোট্টুদা খানিকটা বিরক্তভাবে বলল, 'তুই আবার বেরিয়েছিলি কোথায়? একটা কথা বলে রাখলাম, এটা কলকাতা শহর নয় বলে তুমি রেহাই পাবে না। এখানে ঘাপটি মেরে পড়ে আছ জানতে পারলে চামড়া ছাড়িয়ে নেবে।'

জয়ন্ত ঠোঁট কুঁচকে একটা অবজ্ঞার ভাব করল। আমি তা বলে জেলখানায় বন্দী হয়ে থাকতে পারব না।'

—'না পারবি তো থাকবি না, তোকে কেউ মাথার দিব্যি দিয়ে এখানে রেখে দেয়নি। আর কেউ তোকে শেলটার দেবার জন্য এগিয়ে আসেনি। যার নিন্দে না করে সকালবেলা জলগ্রহণ করিস না. সেই ছোট্টুদাই তোকে বাঁচাবার জন্য বুক বাড়িয়ে দিয়েছিল। —তোকে থাকতে হবে না, যে চুলোয় ইচ্ছে চলে যা—বেরো বলছি।'

এবার সুরঞ্জনের মা ধমকের সুরে বলে উঠল, 'ছোট্টু! তোর একটা বাড়াবাড়ি করার সীমা আছে। এ বাড়ি থেকে বের করে দেবার তুই কে রে?'

সেজদির রাগের চেহারা দেখে ছোট্টুদা প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'না জয়ন্ত, এ বাড়িতেই কিছুদিন থেকে যা। আরে বাবা, তুই আমাদের লেখাপড়া জানা পণ্ডিত খেলোয়াড়। ফার্স্ট ডিভিসনে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ, বি-এতে অনার্স ছিল। এত লেখাপড়া শিখেছিস, মহাভারতটাই মন দিয়ে পড়িসনি? পড়লে দেখতে পেতিস অর্জুনের মত বীরও একটি বছর বৃহন্নলা সেজে অজ্ঞাতবাসে কাটিয়েছে। দাদা পাশা খেলায় হেরে গেছে বলেই, তার এত দুর্গতি। আর তুমি কোথাকার কোন হরিদাস পাল, একটা মাস চাদর মুড়ি দিয়ে ঘরে পড়ে থাকতে পারছ না?' অর্জুন তো ডিরেক্টলি কোন দোষ করেনি, তুমি শীল্ড ফাইনালের মত ভাইটাল ম্যাচে সেমসাইড গোল দিয়ে নিজের দলকে হারিয়েছো।'

উত্তরে জয়ন্ত কিছু না বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর গট গট করে তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল। একটা হলুদ সবুজে মেশানো ছাপা শাড়ি পরে, স্নানের পর ভেজা চুল পিঠে ছড়িয়ে পাখি পেছন ফিরে ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। একটু লক্ষ্য করতেই জয়ন্ত বুঝল, ওর খাটের পাশের ছোট টেবিলটায় পাখি একটা ঝকঝকে পেতলের ঘটিতে রজনীগন্ধার কয়েকটা ডাঁটি সাজাচ্ছে। বাগানের একধারে, একসঙ্গে অনেকগুলো রজনীগন্ধা গাছ প্রায় ঝোপের আকার ধারণ করেছে। সেখান থেকে নিশ্চয় তুলে আনা। জয়ন্ত মনে মনে ভাবল আজ পাখির জন্মদিন। ছোটুদার কথায় জয়ন্ত আঘাত পেয়েছিল। রাগের বাষ্পটা ভেতরে ফুঁসছিল, জয়ন্ত সুযোগ পাওয়া গেছে ভেবে ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'ফুল-টুল এখানে সাজাবার কী দরকার। ফুল আমার অসহ্য লাগে। নিয়ে যান এসব—।

পাখি ওর রাজহংসীর মত সাদা নরম গ্রীবা তির্যক ভঙ্গিতে উঁচিয়ে ধরল, 'আমি আপনার হুকুম তামিল করব, সেকথা কেন ভাবলেন?'

জয়ন্ত এর আগে কোন যুবতী মেয়েকে ক্রুদ্ধ হতে দেখেনি, তাই এ অবস্থায় পড়ে মুহূর্তে তার সব প্রতিরোধ ভেঙে পড়ল। ও এক মুহূর্ত ভেবে তারপর খানিকটা তোষামোদের ভঙ্গিতে বলল, হ্যপি বার্থ ডে টু য়্যু। মেনি হ্যাপি রিটার্নস অব দ্য ডে।'

পাখি খুব শান্ত নিস্তেজ গলায় বলল, 'থ্যাঙ্ক য়্যু'। পাখি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি এখান থেকে চলে যাবেন বলছিলেন…।'

—'আমার এখান থেকে চলে যাওয়াটা এখন ঠিক হবে না, ছোটুদাই বলছিল।'

—'আপনি নিজে কী বলছেন?'

জয়ন্ত একটু থতমত খেয়ে গেল পাখির কথা বলার ধরনে, তারপর বলল, 'আমার হাতে টাকা পয়সা নেই। ছোটুদা যদি কিছু ব্যবস্থা করে দেয়…আপনি যখন আমাকে চলে যেতে বলছেন।'

এবার পাখি ফিক্ করে হাসল। হাসির ধরনটা অনেকটা বয়স্ক

লোকের শিশুকে প্রশ্রয় দেবার মত। 'ফুটবল খেলতে মগজের প্রয়োজন যথেষ্ট বলেই জানি। বুদ্ধিতে শান দিন, খেলার জেল্লা বাড়বে। আমি আপনাকে চলে যেতে বলিনি।' ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় পাখি আবার হাসল। সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে জয়ন্তর। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারটা এতটা জটিল, সে ভাবতে পারেনি।

পাখির জন্মদিনের উৎসবটা বিকেলের দিকে। খাওয়া-দাওয়া রাত্রিতে। বাইরের কয়েকজন নিমন্ত্রিত. তারা একে একে আসতে লাগল। বাড়ি আর বাইরের লোক মিলিয়ে বারো তেরো জনের বেশি হবে না।

সুরঞ্জনের বাবা খুব ব্যস্ত মানুষ। বাড়িতে কোন সময় তার দেখা পাওয়া ভার। ভোরবেলা উঠে বেরিয়ে যান, দুপুরে একবার ঘণ্টা-খানেকের জন্য ফেরেন, তবে সেটা নিয়মিত নয়। না হলে সেই একেবারে রাতে। জয়ন্ত এ ক'দিন এ বাড়িতে আছে কিন্তু ভদ্রলোকের সঙ্গে বিশেষ আলাপ হয়নি।

আজ উনি বলতে গেলে নিতান্ত অসময়ে বাড়ি আছেন। বেশ সুন্দর করে সেজেছেন, গম্ভীর চেহারার সঙ্গে সাজসজ্জাটা মানিয়েছে ভাল। জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে চোখ কুঁচকে একটু হাসলেন, 'কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো ?'

জয়ন্ত অকারণেই একটু লজ্জা পেল, নাঃ অসুবিধে কিসের ?

'আজ এখানে বাইরের লোক যা দেখবেন, তাদের কাছে আপনার আইডেন্টিটি প্রকাশ পেলে কিছু অসুবিধে হবে না। এরা প্রত্যেকেই আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ। আর নিমন্ত্রণের সময় ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে।'

জন্মদিন উপলক্ষ্যে শুধু খাওয়া দাওয়াই নয়, গান-বাজনা গল্প গুজবের ঢালাও ব্যবস্থা হয়েছে। পাখির এক খুব মোটা চেহারার বন্ধু অদ্ভুত একটা ন্যাকা গলায় বিকৃত সুরে গাইল, 'তুই ফেলে এসেছিস কারে মন, মন রে আমার।' গানটা শুনে সুরঞ্জনের হাসি পেল, জয়ন্তর

মুখটাও চাপা হাসিতে ভরপুর। জয়ন্ত দেখল সুরঞ্জনের দাদু হাবুলদা, দিব্যি মাথা নেড়ে নেড়ে শুনছেন। এরপর ছোটুদাকে কিছু বলার আগেই নিজে থেকে গরজ করে 'আফ্রিকা' কবিতাটা আবৃত্তি করতে গিয়ে চার পাঁচ লাইনের পরেই ভুলে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলল। পাখি হারমোনিয়ম ছাড়াই খালি গলায় গাইল 'হেলা ফেলা সারাবেলা, এ কি খেলা আপন সনে।' পাখির গান শুনে জয়ন্ত অভিভূত হয়ে পড়ল। তার বুদ্ধি-শুদ্ধি নিশ্চয় স্বাভাবিকভাবে কাজ করছিল না, সে তাই ভাবল এত ভাল রবীন্দ্র সঙ্গীত আর কখনো সে রেডিও, রেকর্ড, কিম্বা জলসাতেও শোনেনি। গান শেষ হতে না হতেই সারা মুখে লম্বা সাদা দাড়ি, গেরুয়া পাঞ্জাবী আর মাথা ভর্তি টাক নিয়ে এক ভদ্রলোক এসে বেজায় হৈ চৈ শুরু করে দিলেন। 'হ্যাবলা কোথায় গেল, সে তার নাতনীর জন্মদিনে আমাকে নেমন্তন্ন করে এসেছে। ব্যাটা নিজেই ডুব মেরেছে। নির্ঘাৎ কোন সিনেমা হলে গিয়ে বসে আছে।'

—আঃ! গণেশদা, কি যে খামোকা চেঁচাও, এই তো আমি এখানে।' গণেশদা তাকে বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে পাখির দিকে এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে একটা কড়কড়ে দু'টাকার নোট বের করে বলল, জন্মদিনের উপহার। ল্যাবেঞ্চুস খেও।'

পাখি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের হাত ধরে যত্ন করে পাশে বসিয়ে বলল, 'দাদুভাই, তোমার রেট আর বদলালো না। জ্ঞান বয়স থেকে দুটো টাকা পেয়ে আসছি। জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। দু'টাকার ক্যাডবেরির চকোলেট হয় না একটাও—।' বৃদ্ধ পাখির দিকে তাকিয়ে রহস্য করার মত চোখের ঝাপট দিয়ে বললেন, 'এই এইটি ইয়ার্স ওল্ড মোস্ট এলিজিবল ব্যাচিলারের সব সম্পত্তিই তো তুমি নিজের বলে পেতে পার—।'

পাখি বৃদ্ধের পিঠে একটা আলতো করে কিল বসিয়ে কপট ক্রোধের ভঙ্গিতে ওখান থেকে উঠে এল। বৃদ্ধই হঠাৎ প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'হ্যাবলা বলছিল ওদের বাড়িতে নাকি কে এক মস্ত বড় পেলেয়ার এসেছে, আমি অবশ্য বিশ্বাস করিনি, ওটার চিরকালই একটু চাল মারা

স্বভাব। তুই তো ছেলেবেলায় খেলা বলতে ঘরে বসে পুতুল খেলেছিস্, আর তোর বাড়িতে একজন জলজ্যান্ত খেলোয়াড় এসে থাকবে, এটাও আমাকে বিশ্বাস করতে বলছিস ?'

বৃদ্ধের কথা সকলে উপভোগ করলেও, সুরঞ্জনের দাদু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, 'এইসব ছেলে-ছোকরাদের সামনে আমাকে হেনস্তা করে কী লাভ ? তোমার হাঁড়িও আমি হাটে ভাঙতে পারি। জামশেদপুরে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে মনে নেই, লাঞ্চে এ্যাইসা খেয়েছিলে, তারপর আর ফিল্ডিং করতে নামতে পারলে না। পরদিন পেট খারাপ করে সারাদিন টেণ্টে শুয়ে রইলে, তোমার জন্যই সেবার টিম হেরেছিল।'

বৃদ্ধ মিটি মিটি হেসে কথাটা হজম করে নিল। তারপর জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার কেসটাই এক্কেবারে নতুন। তার মানে তুমিই সেই শাপভ্রষ্ট খেলোয়াড়। কলকাতার নন্দন-কাননে যে ভুল করেছো, তাতে নির্বাসন দণ্ড মাথায় নিয়ে এই সেমি অজ পাড়া-গাঁয়ে নরকবাস করতে এসেছো। তা ভাল !'

জয়ন্তর দিকে আঙুল তুলে পড়া ধরার মত করে জানতে চাইল, মোহনবাগান প্রথম কবে আই এফ এ শীল্ড পায় ?'

জয়ন্ত বলল, 'সে সবাই জানে, ওটা প্রশ্ন নয়।'

—'ফাজলামো করো না। সবাই জানে তো কী? তোমার জানা আছে ? ফুটবল খেলছো, এদিকে ভারতের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গৌরব-জনক ইতিহাসটা ভুলে বসে আছ। সাধে বলে বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাত। বুঝলে হে ছোঁড়া ১৯১১-র সেই ঐতিহাসিক শীল্ড ফাইনাল আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আমার তখন ষোলো সতেরো বছর বয়স।'

এ গল্প জয়ন্ত ছাড়া উপস্থিত আর সকলের নিশ্চয় বহুবার শোনা, তবু গল্পটা ভাল বলে কেউ বলায় বাধা দিল না।

'ওঃ সে সময় মোহনবাগানের খুব নামডাক। সব বড় বড় ষণ্ডা-গুণ্ডা গোরার দলকে শীল্ডের খেলায় হারিয়ে দিচ্ছে। মোহনবাগানের দুই খেলোয়াড় শিব ভাদুড়ী আর বিজয় ভাদুড়ীর কথা লোকের মুখে মুখে ! সবাই অবশ্য ওদের শিবে আর বিজে বলে ডাকত।

সেই শীল্ড ফাইনাল দেখতে লোক এসেছিল দিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর থেকে। সকাল দশটা থেকেই কাতারে কাতারে লোক গিয়ে মাঠ ভরিয়ে ফেলল। মাঠের চারদিক দড়ি দিয়ে ঘেরা। মাটিতে বসে বিনে পয়সায় খেলা দেখা, চেয়ারে বসতে গেলে আট আনা পয়সা দিতে হবে। ইডেন গার্ডেনের একটাও গাছের ডাল ফাঁকা নেই। ফুটবল লাভাররা সেখানে বাঁদর-ঝোলা ঝুলছে।

ইস্ট ইয়র্কের সঙ্গে খেলা—তাদের ক্রেসী নাকি বিশ্ববিখ্যাত গোলকিপার, আমাদের হীরালালই বা কম কিসে? একদিকে গোঁট্টাগোট্টা সবুট-পা, আর একদিকে বাঙালীর লিকলিকে খালি পা। তাই নিয়েই বাঙালীরা জোর লড়াই চালাচ্ছে। হাফ টাইম হতেই হাঁফ ছাড়লাম।

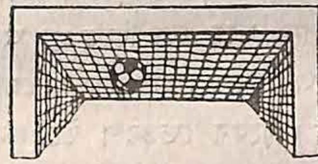
হাফ টাইমের পর খেলা শুরু হতেই ইস্ট ইয়র্ক দল যেন মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের জখম করতে মরিয়া হয়ে উঠল। এমন সময় মোহনবাগান এক গোল খেয়ে গেল। যত সাহেব, মেম আর গোরা সৈন্যদের সে কী উল্লাস, সে কী উন্মত্ত চিৎকার। কয়েকজন বাঙালী যারা নিজত্বকে বর্জন করে ইংরেজের শ্রীচরণে দাসখৎ লিখে দিয়েছে, তারাও এদের সঙ্গে তাল দিয়ে হৈ চৈ করছিল।

তবে গোল খেয়ে মোহনবাগান দমেনি। শিবে আর বিজের ঠ্যাঙগুলো যেন যাদুকরের মায়া দণ্ড—ভেল্কি দেখিয়ে দিল। হঠাৎ শিব ভাদুড়ী অর্থাৎ আমাদের শিবের পায়ে বল আসতেই বিশ্ববিখ্যাত গোলকিপার ক্রেসী কিছু বুঝে ওঠার আগেই বলটা ক্রসবারের কোণ দিয়ে স্ক্রুর মত পাক খেতে খেতে ঢুকে গেল।

উঃ সে কী উত্তেজনা! প্রত্যেক ভারতীয়ের সে কী নাচ। ইডেনের গাছে ঝোলা একজন আনন্দে হাততালি দিতে গিয়ে একেবারে ইহলোকের সব খেলা ঘুচিয়ে ফেলল। মোহনবাগানের হয়ে সেকেণ্ড গোলটা করল অভিলাষ ঘোষ। সাহেব বাচ্চাদের মুখ একেবারে শুকিয়ে আমসি। আর বাঙালীদের গর্জন শুনে মনে হচ্ছে হাজার হাজার পশুরাজ একসঙ্গে গর্জন করছে! ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডের আকাশ শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়া ছাতা, লাঠি, ওয়াটারপ্রুফ, চটি জুতোয় ঢাকা পড়ে গেল।

গল্প আর কতক্ষণ চলত তার ঠিক নেই, এমন সময় ডাক এল খাওয়ার, পেছনের বারান্দার একসঙ্গে সকলের জায়গা করা হয়েছে। পাখি খেতে বসেনি, পরিবেশনের কাজে ও মাকে সাহায্য করবে। পাখি দেখলো জয়ন্তর একপাশে রঞ্জু বসেছে, আর একটা পাশের আসন খালি ছিল, তিন্নি ছুটে এসে ওখানে বসে পড়ল। জয়ন্তকেও খুব খুশী খুশী মনে হচ্ছে। সারাক্ষণের মনমরা ভাবটা নেই। রঞ্জুর সঙ্গে আজ সকালে জয়ন্তর ভাব হয়ে গেছে, তিন্নির তো বেস্ট ফ্রেণ্ড এখন জয়ন্ত। মাও ওকে খুব ভালোবাসছে। এ ধরনের প্রীতির বন্ধন দেখে পাখি খুব খুশী হল। সব মানুষ সুখে আর খুশীতে থাকলে পাখি খুব নিশ্চিন্ত বোধ করে। ওর মনের ভেতরটা খুব কোমল। কিন্তু ও ঠিক জানে না। কি কারণে জয়ন্তর সঙ্গেও দু'একটা রূঢ় কথা বলে ফেলছে।

সারা বিকেল, সন্ধ্যে, রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্যন্ত বেশ হৈ চৈ করে কাটল। তারপরই হঠাৎ ঝুপ করে একটা স্তব্ধতা নেমে এল বাড়িতে। শুতে যাবার সময় জয়ন্ত লক্ষ্য করল আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে খাটের পাশে টেবিলে রাখা রজনীগন্ধার মৃদু গন্ধ পেল। সে রাতে জয়ন্ত অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলো।



একটা নির্জন বাতিঘরে জয়ন্ত একলা রয়েছে। সমুদ্রের বালিয়াড়িতে দু'দিকে দুটো গোল পোস্ট পোঁতা। জয়ন্তর পরনে খেলোয়াড়ের পোশাক। সমুদ্রতীরের প্রবল বাতাসে একটা বল বিদ্যুৎ গতিতে ভেসে আসছে। জয়ন্তর গোলে ঢুকে গেল বলে। সে ছাড়া আর কোন শরীরী খেলোয়াড় সেখানে নেই। জয়ন্ত ছুটে যেতে চাইল কিন্তু পা-দুটো বালিতে গেঁথে যাচ্ছে। জয়ন্ত যত চেষ্টা করছে, তত সে ভেতরে ঢুকছে। প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে। জয়ন্ত দেখলো বলটা গোলমুখে স্থির হয়ে ভাসছে। ও চিৎকার করে উঠল, 'শিগগির কেউ বলটা ধর,

গোল হয়ে যাবে এক্ষুণি।' কিন্তু সেই নির্জন বালিয়াড়িতে সে ছাড়া আর কেউ নেই। কে শুনবে তার কথা?

একটু বাদে জয়ন্ত লক্ষ্য করলো সে যার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, সেটা বালি নয়, অজস্র অসংখ্য ফুটবলের স্তূপ। প্রথম জীবনে যার হাতে ধরে ফুটবল মাঠে এসেছিল, সেই বেচুদা, এখনকার ক্লাবের কর্মকর্তা পি সি ঘোষ, ছোট্টুদা, পাখিরা একে একে এসে দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়ালো।

—'আমাকে বাঁচাও! আমি ডুবে যাচ্ছি।'

বেচুদা খুব নির্বিকারভাবে জানালো, 'তুই ফুটবল ভালবাসতিস, তাতেই ডুবছিস্ দুঃখ কী রে?'

জয়ন্তর বুক পর্যন্ত ডুবে গেছে! আতঙ্কে চোখ দুটো কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বাঁচাও!'

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর হাবভাবে দার্শনিকের নির্লিপ্ততা। ও ডুবে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে পাখির মুখের দিকে তাকিয়ে একটু সহানুভূতি খুঁজল। পাখি গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনি তো ফুটবলের গভীরে যাচ্ছেন, ভয় পাচ্ছেন কেন?' একেবারে তলিয়ে যাবার আগে ছোট্টুদা বলল, 'জয়ন্ত! যাবার আগে একটা কথা জেনে যা, ফুটবল থেকে এদেশে ফুটবলাররা খুব একটা ফয়দা তুলতে পারে না। খ্যাতি, অর্থ, যে যতই পাক, তার চেয়ে দিতে হয় অনেক গুণ বেশী।'

ছোট্টুদার কথাগুলো জয়ন্ত প্রায় জেগে জেগেই শুনল। ঘামে ভিজে গেছে সব কিছু। বুকের ভেতরটা উত্তেজনা আতঙ্কে ধড়াস ধড়াস করছে। ও উঠে এক গ্লাস জল খেল, তারপর বিছানায় না ফিরে, জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আকাশটা এতদিনে মেঘমুক্ত হয়েছে। শরতের আকাশে চাঁদ দেখে ছোটবেলায় পড়া একটা কবিতার কথা মনে পড়ল, 'জ্যোৎস্না-সমুদ্রে তরী যেন চাঁদ।'

ফুলের বাগানের ওপর জ্যোৎস্নার একটা মিহিন প্রলেপ। জয়ন্তর বড় ভাল লাগলো। ও ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বড় দরজার পাশে, খিল লাগানো ছোট কাঠের দরজাটা ওকে টানছে। জয়ন্ত ছুটে গিয়ে, খুব ব্যস্তভাবে দরজার খিল খুলে বাইরে এল। বাড়ির সামনে অনেকটা

উঁচুনিচু ঘাস জমি। চাঁদের আলোয় শেয়াল কাঁটার হলুদ ফুলগুলোকে অলৌকিক মনে হচ্ছে। জয়ন্ত এলোমেলোভাবে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালো।

তারপর হঠাৎই ওর নজরে পড়ল শেয়াল কাঁটার ঝোপের পাশে একটা হলুদ রঙের বল পড়ে আছে। এখন সে স্বপ্ন দেখছে না, রীতিমত সজাগ সে। বলটা দেখে কাছে যেতেই সেটা দ্রুত সরে গেল। জয়ন্ত বল ধরার জন্য হাল্কা পায়ে দু'এক কদম ছুটল। বলটা ওর নাগালের বাইরে গিয়ে স্থির হয়ে আছে। জয়ন্ত জোরে ছুটে গেল, বলটা আরো জোরে ছিটকে সরে গেল। একটু পরিশ্রমেই জয়ন্তর গা দিয়ে কুল কুল করে ঘাম ঝরতে শুরু করেছে।

জয়ন্ত মনে মনে ভাবল 'হ্যালুসিনেশন,' ওর অলীক দর্শন ঘটছে। কথাটা মনে হতেই ও আর বলটা খুঁজল না। একটা হতাশার ঠাণ্ডা ভারী বোঝা বুকের ওপর চেপে বসল। জয়ন্ত ধীর পায়ে বাড়িতে ঢুকল।

পরদিন ঘুম ভাঙলো একটু বেলায়। চোখ মেলে দেখলো ঘরে একটা মোড়ায় বসে ছোট্‌দা খবরের কাগজ পড়ছে। জয়ন্তর সঙ্গে চোখাচোখি হতে বলল, 'সেমিফাইনাল ম্যাচ খেলার পর তোকে যখন নোনাতলার সেই ফ্ল্যাটে নিয়ে যাচ্ছিলাম, শতদল ভদ্রর সঙ্গে তোর রাস্তায় দেখা হয়েছিল।' কথাটার ধরনই এমন, যে তাতে জয়ন্তর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠার যথেষ্ট ইন্ধন ছিল। কিন্তু কথাটা ওর মগজে গিয়ে ততটা তীক্ষ্ণভাবে আঘাত করল না। ও বোকার মত বলল, 'এ্যাঁ'?

ছোট্‌দা কাগজে মুখ ডুবিয়েই বলল, 'ক্লাব তোদের জন্য অনেক কিছুই করে, তোদের ধারণাটা যদিও অন্যরকম।'

জয়ন্ত উঠে বসে বলল, 'এসব বোকা বোকা কথা নিয়ে ঝগড়া করতে আমার ভালো লাগে না।'

—'তা যাক্‌গে। শতদল ভদ্র তোকে সেদিন যা বলেছিল—।'

—'শতদলদা আমার গুরু স্থানীয়। ওর সঙ্গে দেখা হলেই কথা বলি। যেদিন দেখা হয়েছিল, সেদিন তুমিও সঙ্গে ছিলে।'

'গাড়ি থামিয়ে ওষুধ কিনতে গিয়েছিলাম। তুই রাস্তায় দাঁড়িয়ে-

ছিলি। তখন তোর সঙ্গে দেখা হয়, আমি আসার পরই তোরা কথা বন্ধ করে দিয়েছিলি।'

জয়ন্ত বলল, 'আমি আগেই বলেছি, শতদলদা আমার গুরু, তাকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

ছোট্টুদা খুব কুটিল একটা হাসি দিল, অনেকটা সিনেমার ভিলেনের মত। 'তুই বুঝি তাই সেদিনের গোলটা দিয়ে গুরু-প্রণামী দিলি ?'

'ছোট্টুদা !' জয়ন্ত লাফিয়ে উঠেছে ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মত, 'ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট।'

—'আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। বুঝতেই পারছিস এত বড় একটা ঘটনা ঘটে যাবার পর ক্লাব চুপচাপ বসে ছিল না। খোঁজ খবর করতে গিয়ে কেঁচো খুঁড়তে বিরাট এক সাপ বেরিয়ে পড়েছে। আমি কিছু বলছি না, তবে অনেকে বলছে, তুই নাকি—।' কথাটা শেষ করল না ছোট্টুদা। জয়ন্ত এক দৃষ্টিতে ছোট্টুদার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, 'থামলে কেন ? বলো—বলো আমি ঘুষ খেয়েছি। ছিঃ-ছি !' জয়ন্তর মুখটা বিকৃত হয়ে গেল।

—থিয়েটার করিস না জয়ন্ত। শুধু একটা কথা মনে রাখিস, বিশ্বাস-ঘাতককে ভবিষ্যতের জন্য কেউ বিশ্বাস করে না। তুই কি ভাবছিস্ নেক্সট্ সিজনে শতদল ভদ্র তোকে আদর করে নিজের দলে নিয়ে যাবে ? ফুঃ !'

জয়ন্তর রাগটা এখন কমে এসেছে, বরং মনের মধ্যে একটা অবসাদের ভাব। ও ছোট্টুদার কথার উত্তর দিতে গিয়েও থেমে গেল।

—'ক্লবের লোকেরা চায় না যে, আমার ব্যবস্থা করা আশ্রয়ে তুই আর থাকিস্ ?'

—'ক্লাবের লোক বলতে কারা ? বিভূতিদা কি বলেছে ? পি সি ঘোষ-এর ভার্সন আমার শোনার দরকার নেই।'

বিভূতিদা-র কথায় ছোট্টুদা একটু ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। তারপর একটু জোর দিয়েই বলল, 'মোট কথা এ বাড়িতে তোর থাকাটা আর ঠিক হবে না।'

জয়ন্ত খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'টাকা নিয়ে আসতে পারিনি। কিছু

টাকার ব্যবস্থা করো। আমি চলে যাবো আজই।'

—'মা'র সঙ্গে তোর যে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট আছে, সেখান থেকে হাজার টাকা তুলে দিয়ে গেছেন তোর মা।'

কেব্‌ল্ ফল্টের জন্য ক'দিন আলো জ্বলছিল না বাড়িতে। সেটা সারাই হয়ে যাওয়ায় জয়ন্ত পড়ন্ত বিকেলে ভ্যাপসা গরমে ঘরে বসে ফ্যানের হাওয়া খাচ্ছিল ছোট্টুদার কাছ থেকে সে হাজার টাকা পেয়েছে। ছোট্টুদা দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করেই কলকাতার দিকে রওনা হয়ে গেছে। যাওয়ার সময় জয়ন্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কাল সকালেই যে এখানকার পাট চুকিয়ে চলে যাবে। ছোট্টুদা জয়ন্তকে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে, তার সম্বন্ধে কোন-রকম দায়দায়িত্ব আর নেওয়া যাবে না। নিজের ভালোমন্দ আপদ বিপদ নিজেকেই বুঝতে হবে।

জয়ন্ত মনে মনে ভাবছিল, এখান থেকে কোথায় যাবে? অফিসে একটা খবর দেওয়া দরকার। অফিসে প্রায়ই তাকে ছুটি-ছাটা নিতে হয়। আজ এ টুর্নামেন্ট, কাল ও টুর্নামেন্ট—করতে করতে সত্যি কথা বলতে কি অফিস করা তার প্রায় হয়ে ওঠে না। ব্যাঙ্কের চাকরি—কাজকর্ম ওর বরাদ্দে কিছুই নেই, মাঝে মধ্যে খাতাপত্তর টেনে নিয়ে একটু আধটু কাজ করে, ডিপার্টমেন্টাল বস স্পষ্টই বলে দিয়েছে, সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। জয়ন্ত কাজ না করলেই তিনি খুশী।

অফিসে নানা ফিকিরে ছুটির দরখাস্ত করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে গোপীনাথবাবু। এখন সামনে গোপীনাথবাবু নেই। জয়ন্ত বুঝে পেল না, ঠিক কিভাবে আর্জিটা জানাবে?

জয়ন্তর চিন্তাটা কিছুতেই এক জায়গায় স্থির থাকছে না। এখান থেকে যাওয়ার কথা ভাবতে গিয়ে ওর মনটায় বিষাদের ছোঁয়া লাগল। এ বাড়ির লোকগুলো বড় ভাল। বাড়ির লোকদের দয়া মায়া, ভালোবাসার ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিকভাবে একজনের আরেকজনের প্রতি সঞ্চারিত হয়। সেখানকার পরিবেশ ও প্রচলিত রীতির সঙ্গে

পারস্পরিক সম্পর্কগুলো এমন একটা নির্দিষ্ট মাপে বাঁধা আছে, যে কমবেশী হলেই বেসুরো বাজে। কিন্তু আনাত্মীয়, সম্পূর্ণ অপরিচিতকেও যে এমনভাবে কাছে টেনে নেওয়া যায়, সে খবরটা জয়ন্তর কাছে একেবারে নতুন।

ছোটুদা আজ যে কথা বলে গেছে, তাতে স্বাভাবিকভাবে জয়ন্তর মনে হয়েছে, তার ক্লাব তাকে আর নাও ডাকতে পারে। যদি না ডাকে তবে কি হবে? বড় ক্লাবে খেলার দফা গয়া হয়ে যাবে। সেমসাইড গোল দেওয়ার জন্য তখন তাকে ঘিরে যে অসন্তোষ সাপোর্টার মহলে তৈরি হয়েছে, সেই ক্ষতটা সময়ের প্রলেপে নিরাময় হবে, একটা দাগ থেকে যাবে বড় জোর। কিন্তু ক্লাব কর্মকর্তারা অন্য ধাতুতে গড়া। জয়ন্তকে এরপরে হয়ত খেলোয়াড় নাম টিকিয়ে রাখার জন্য নগণ্য কোন দলের দরজায় যেতে হবে। বিষয়টি নিশ্চয়ই জয়ন্তর পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু সেভাবে কোন চিন্তা এখনো তার মগজে আসছে না। সে এই নতুন পরিবেশে বেশ নিরাপদ বোধ করেছে। প্রথম প্রথম অস্বস্তিটা ছিল। চলে যাওয়ার কথা সব সময়ই বলেছে, এখনো বলছে, কিন্তু ইংরেজি 'এল অক্ষরের মত, মফঃস্বল শহরের বাগানে ঘেরা বাড়ি আর তার লোকজন মনের মধ্যে অনেকটা গভীরে শিকড় নামিয়ে দিয়েছে। সত্যিকারের শিকড় ছেঁড়ার সময় বড় বুকে বাজছে। ঘরের বাইরে আর একটা ঘর পেয়ে জয়ন্ত ভারী লোভী হয়ে পড়েছে। এই মোটামুটি শান্ত শহরে একটা যেমন তেমন চাকরি পেয়ে গেলে, ও নিজেকে ধন্য মনে করে থেকে যেতে পারে, এমন একটা মনের ভাব। তার ভালোবাসার ফুটবল, খেলোয়াড় জীবনের খ্যাতি-অখ্যাতির পেছন থেকে একটা মানুষ বেরিয়ে পড়েছে, যে অনায়াসেই নির্জন সমুদ্র তীর কিংবা পাহাড়ী ঝর্ণার পাশে একটা কুটীর গড়ে আজীবন বাস করতে পারে। মাটির নিকোনো উঠোন, লাউ মাচা, শান্ত গৃহশ্রী ইত্যাদির চিন্তা জয়ন্তর সেই ভেতরকার মানুষটার কাছে জ্যৈষ্ঠের দুপুরে শীতল দীঘিতে স্নান করার মত সুখকর।

জয়ন্ত অন্যমনস্কভাবে দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল। বারান্দায়

দাঁড়িয়ে রঞ্জু। ওর হাতে বল। রঞ্জু হয়ত বলতে চাইছে জয়ন্তকে খেলার কথা—সঙ্কোচে বাধছে। কালকে সকালে আকস্মিকভাবেই দুজনে দু'জনের কাছে এসে গিয়েছিল। রঞ্জুকে ভালো লেগেছে জয়ন্তর, ছেলেটার খেলার প্রতিভা আছে। ভালো শিক্ষকের হাতে পড়লে, ঘষা মাজা হলে জৌলুস ফুটবে।

রঞ্জু একসময় ঘরে ঢুকে বলটা মেঝেতে রেখে চেয়ার টেনে বসল, রঞ্জুর চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায়, ও একটা কিছু বলতে চাইছে। জয়ন্ত বলল, 'কিছু বলবে?'

রঞ্জু মুখটা নিচু করে রইল। জয়ন্ত আবার জিগ্যেস করল, আচ্ছা, আমাকে একটা খবর দিতে পার? আমি যে পাণ্ডবদের মত এখানে অজ্ঞাতবাসে কাটাচ্ছি, সে খবরটা কতটা চাউর হয়েছে?'

রঞ্জু বয়সে ছোট হলেও, কথার মধ্যে একটা পরিপক্কতার ছাপ আছে, যেটাকে ঠিক বয়সের সঙ্গে বেমানান লাগে তবে বক্তার বুদ্ধির প্রতি সম্ভ্রম জাগায়।

রঞ্জু একটু হেসে বলল, 'বাইরের লোক অন্তত দশ বারো জন জানে। ছোট্টা জায়গা। একজন জানলেই ব্যাপারটা দশ কান হতে সময় লাগে না। আপনার ক্ষেত্রে ঘটনাটা একদম অন্যরকম ঘটল, যারা জানল তারা প্রত্যেকে মুখে চাবি দিয়ে রয়েছে; তাই খবরটা ছড়ায়নি। মিত্তির মাসীমা যখন জানতে পারল, তখন আমরা বাড়ি শুদ্ধ লোক ভয়ে সিঁটিয়ে ছিলাম। ওর পেটে কোন কথা বাসী হয় না। কিন্তু তিনিও যখন খবরটা বেমালুম হজম করে দিলেন, তখন আমরা নিশ্চিন্ত হলাম কিছুটা।

হঠাৎ দমকা বাতাসের মত ঘরের মধ্যে তিন্নি এসে ঢুকল। একটা হাঁটু ছাড়ানো লাল ছাপা জামায় ওকে ভারী সুন্দর লাগছে। 'দাদা তুই বলেছিস্ জয়ন্তদাকে?' রঞ্জু ওকে চোখ পাকিয়ে নীরবে তিরস্কার করল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তিন্নি বলল, 'দাদাকে আপনি, মানে যে কদিন আছেন, ফুটবল শেখাবেন? দাদাটা এত্ত ভীতু, মার কাছে গিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর করছিল। আপনাকে সোজাসুজি বলার মুরোদ

নেই। —প্লিজ দাদাকে একটু শেখান না। ও যদি ইস্ট বেঙ্গল মোহন বাগানে কোনদিন খেলে, আমি তবে রেগুলার মাঠে যাবো। হাউ থ্রিলিং—বিউটিফুল ট্যাকলিং—বডি সোয়ার্ভ করল ডাইনে বাঁয়ে অপোনেণ্ট টিমের দুটো দুটো চারটে প্লেয়ার বোকা বনে ছিটকে পড়ল, তারপর ছোট্ট একটা ডজ। টপ অব দ্য বক্স থেকে একটা ব্যানানা কিক— গোলকিপারটা তখন মাটিতে আছড়ে পড়ে ল্যাটা মাছ ধরছে আর বলটা ততক্ষণে জালে জড়িয়ে গেছে।' উইথ ডেমনেস্ট্রেশন কথাগুলো বলতে গিয়ে তিন্নি একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। থুতনির কাছে ঠোঁটের তলার ভাঁজটায় বিন্দু বিন্দু ঘাম চিক চিক করছে। ওর কথার ধরনে জয়ন্ত আর রঞ্জু হাসিতে ঘর ফটিয়ে ফেলল। ওদের হাসি দেখে তিন্নি বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলল, 'যাক্‌গে দাদার খেলা শেখার ভারটা নিচ্ছেন তো ?'

রঞ্জু তেড়ে উঠল, 'তুই ভাগ্‌ তো, পাকামো করতে হবে না, তুই কি আমার গার্জেন ?'

—'ওমা, একথাটা তুই এতদিন জানিস না ! দু'বছর আগেই তো ওই পোস্টে আমার অফিসিয়্যাল এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট হয়েছে।'

'মেয়েটা ভারী ফোক্কর।' রঞ্জু ছোট বোনের চুলের গোছা আদর করে টেনে দিল।

জয়ন্ত যে কাল সকালেই চলে যাবে,এখবরটা এই দুই ভাইবোনকে দিতে খারাপ লাগছিল। জয়ন্ত কিছু না বলে হাসি হাসি মুখে চুপ করে রইল।

সন্ধ্যের দিকে জয়ন্ত রঞ্জুর মাকে একা পেয়ে বলল, 'সেজদি একটা কথা ছিল ?—আমি কাল সকালে চলে যাব।' জয়ন্ত ভেবেছিল সেজদি একথায় খুব অবাক হবে, বিচলিত হয়ে বারবার থেকে যাবার কথা বলবে, সেসব কিছুই হল না। খুব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'কোথায় যাবে, কলকাতায় ?'

—'না, সেখানে নয়, অন্য কোথাও। রাঁচীর দিকে যেতে পারি। সেখানে মামা বাড়িতে আমার মা বোন রয়েছে। মোট কথা কাল

সকালেই বেরিয়ে পড়ছি।'

—'তাই যেও। কি আর বলব, ভালো থেকো। যখনই ইচ্ছে করবে, আমাদের এখানে চলে এসো। —হ্যাঁ শোনো, রঞ্জু তোমাকে ফুটবল কোচিং-এর কথা কিছু বলেছে? ওসব কিছুর দরকার নেই। তাছাড়া তুমি তো চলেই যাচ্ছ।'

—'রঞ্জুর প্রতিভা ছিল, ওর মনে হয় চেষ্টা করলে হত।'

—'হত কি না হত, সেটা তোমরা বুঝবে। আমি চাই না রঞ্জু স্পোর্টসটাকে প্রফেশন হিসেবে নিক। এক ছেলে বলে আঁচলের তলায় ঢেকে রাখতে চাই না, তবে তোমাদের স্পোর্টস ওয়ার্ল্ডে স্পোর্টসম্যানের সংখ্যা কম। হয় আমার রঞ্জু টেনসনে ভুগবে—নানা কারণে; নয়তো স্পোর্টসের নামে ও একটা বাজে ছেলে হয়ে যাবে।'

জয়ন্ত কিছু একটা বলার চেষ্টা করতেই, রঞ্জুর মা বলল, 'আমি খেলার মাঠের সব খবর জানিনা। একটু আধটু শুনি, দু'এক জায়গায় লেখা টেখা পড়ি, সবশেষে দেখলাম তোমাকে। আমার সিদ্ধান্তে ভুল হতে পারে। তবে ও জায়গাটা আমার খুব একটা নিরাপদ বলে মনে হয়নি।'

'সেজদি এখানে এসে আমি নানা কথা ভেবেছি। ফুটবলকে ভালোবেসে যখন এ শাস্তিটা পেলাম, অভিমানে মনে হয়েছে, খেলা ছেড়ে দেব। কিন্তু আজ আপনার কথা শুনে, আবার আমি নতুন করে ভাবছি। মরুভূমিতেও গাছ জন্মায়, ফুল ফোটে। কোন কিছুর পুরোটা খারাপ হতে পারে না।'

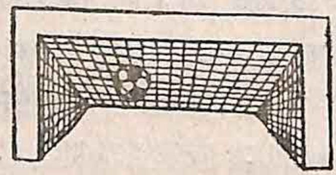
—'তর্ক ক'রো না। রঞ্জু যদি মন প্রাণের ইচ্ছে থেকে ফুটবলার হয়, তাহলে আমার বলার কিছু নেই। তবে দুঃখ পাব।'

—'ভালো কথা, কাল তুমি কটায় বেরোচ্ছো? স্টেশনে যাওয়ার বাস এই সামনের মোড় থেকে সাতটা পঁয়ত্রিশে ছাড়ে। রিক্সাতেও যেতে পার।'

—'আমি রিক্সাতেই যাবো।'

—'ঠিক আছে, আমি জল খাবার করে দেব সাতটার মধ্যে।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর শুতে এসে জয়ন্ত বিস্মিত হল। খাটের পাশের টেবলে একটা কাঁচের প্লেটে অনেকগুলো বেল ফুল রাখা। ঘরের আলোটা নিভিয়ে দেবার পর জয়ন্ত অনেকক্ষণ ধরে প্লেটের ফুলগুলোর ঘ্রাণ নিলো। ও আন্দাজ করতে পারল, পাখি এটা তাকে বিদায় উপহার হিসেবে দিয়ে গেছে। জয়ন্ত বিছানায় দেহ ছেড়ে দিতেই ঘুম চলে এল। তার আগেই সে মনের ভেতর থেকে নির্দেশ পেয়ে গেছে, আগামীকাল সকালেই এ বন্দরের কাল শেষ হবে।



জয়ন্ত যখন এ বাড়িতে এসেছিল, সে ঘটনাটা অনাড়ম্বর হলেও, তাতে নাটকীয়তা ছিল। বিদায়ের পালাটা খুব সংক্ষিপ্ত, এবং সাদামাটা হল। আসলে সকলেই ঠিক করে রেখেছিল, নিজেদের আবেগ প্রকাশ করে, অবস্থাকে জটিল করে তুলবে না। সকাল সকাল বেরোতে হল জয়ন্তর, পাখি তো তখন বিছানা থেকেই ওঠেনি। অন্যদিন উঠে যায়, আজ নাকি অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়।

স্টেশনে পৌঁছে জয়ন্ত হাওড়া যাওয়ার টিকিট কাটল। ও অন্য কোথাও যাওয়ার কথা অনেক ভেবেছে, শেষপর্যন্ত কোনটাই পছন্দ হয়নি। কলকাতায় ফিরে যাওয়ার একটা জেদ এই মুহূর্তে ওকে পেয়ে বসেছে। জয়ন্ত ঠিক করেছে, বিভূতিদা আর ক্লাবের অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে ও দেখা করবে। এভাবে পালিয়ে বেড়ানোটা কাজের কথা নয়—তাতে ক্লাব কর্তৃপক্ষের সন্দেহ জাগতে পারে,জয়ন্তর সত্যিই দোষ আছে বলে।

গাড়ির দেরি ছিল। জয়ন্ত আর রঞ্জু বিরাট একটা শিরীষ গাছের তলায় বাঁধানো বেদীতে বসলো। জয়ন্ত নিয়মিত সিগারেট খায় না, মাঝে মধ্যে এক আধটা। আজ সে স্টেশনে এক প্যাকেট সিগারেট কিনেছে।

স্টেশনে অনেক লোকজন। হাওড়ার গাড়ি ধরার জন্য অপেক্ষা করছে। ওভারব্রিজ টপকে এক এক করে আরো লোক আসছে।

জয়ন্ত হিসেব করে দেখল এদের মধ্যে অন্তত চল্লিশ পার্সেন্ট লোক কলকাতা ফুটবল নিয়ে হৈ চৈ করে। তাদের প্রায় সকলেরই জয়ন্তকে চেনার কথা। সকলে খেলা না দেখলেও ছবি-টবি দেখেছে। কিন্তু ওর দিকে কেউই নজর দিচ্ছে না। জয়ন্তর যা জনপ্রিয়তা তার চেয়ে অনেক কম জনপ্রিয়তার একজন ফিল্ম স্টারকেও লোকেরা ভিড়ের মধ্য থেকে চট্ করে আলাদা করে ফেলতে পারে। সিনেমার অভিনেতারা চেহারা কথাবার্তা চালচলনে আর দশজনের থেকে একটু আলাদা-- জয়ন্তর ধারণা সেটাই প্রকৃত গ্ল্যামার। আর তার জন্যই তাদের পৃথক করে ফেলা যায়।

জয়ন্ত একটু ভয়ে ভয়ে ছিল। সেই উদ্ভট গোলের পর বলতে গেলে এই প্রথম সে প্রকাশ্য স্থানে এসেছে। জনতার রোষ, প্রচণ্ড প্রহার, কুৎসিত গালাগালি থুতু ছেটানো—সব কিছু ওর মনে দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মত ভারী হয়ে রয়েছে।

জয়ন্তর মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি আপনা থেকেই ঘুলিয়ে উঠছিল। একসময় ও বিরক্ত হয়ে উরুতে চাঁটি মেরে বলল, 'চলো, রঞ্জুবাবু! একটু চা খেয়ে আসা যাক।'

চায়ের দোকানটার সামনেটা খালি। পাশের কলতলায় কলের ছুটো মুখ থেকেই তোড়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, লোক নেই কোন।

চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে জয়ন্ত রঞ্জুর দিকে তাকাল। স্টেশনের লোহার বেড়া পেরিয়ে দূরের দিকে রঞ্জুর দৃষ্টি নিবদ্ধ। রুক্ষ চুলগুলো টালমাটাল বাতাসে পতাকার মত উড়ছে। রঞ্জুর হাতে ধরা চায়ের ভাঁড় থেকে ধোঁয়া উঠছে সূক্ষ্ম রেখায়।

ছেলেটা ফুটবল খেলতে জানে। চেহারাটা ভালো, খাটবার ক্ষমতা আছে। মাঠে একদিন দেখে এর বেশী কিছু মনে হয়নি। জয়ন্তর ছোট্‌দা ওর মামা, কলকাতায় মামাবাড়িতে থেকে ছেলেটা লেখাপড়া আর খেলা, ইচ্ছে করলে ছুটোই চালিয়ে যেতে পারে। রঞ্জু ওর মামাকে না বলে আকারে ইঙ্গিতে লোক মারফৎ জয়ন্তকে বলেছে। সুরঞ্জনের খেলার কথা ভাবতে গিয়ে, নিজের এই বয়সটার কথা মনে পড়ল তার।

জয়ন্ত একবার একটা বিদেশী ম্যাগাজিনে ছবি দেখেছিল। একটা মিউজিয়ামের ছবি—এক সারিতে পরপর অনেকগুলো খোলা দরজা পেরিয়ে অনেক দূরে একটা পাথরের নারী-মূর্তির আভাস দেখা যাচ্ছে। ঠিক সেরকম স্মৃতির অনেকগুলো দরজা পেরিয়ে জয়ন্ত দেখতে পেল দারিদ্র্য আর সংকল্পের হাতে হাত ধরে হেঁটে যাওয়া তার কৈশোর জীবনের ছবি।

রং ওঠা গেঞ্জি আর প্যাণ্ট ঘামে ভিজে গেছে। বলটা নিয়ে একাই সারা মাঠ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। খিদে ভাবটা কিছুক্ষণ আগেও যা শুধুমাত্র পেটের মধ্যে অনুভূতি জাগাচ্ছিল, এখন সেটা সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছে। মগজ পর্যন্ত উঠে সেখানে গিয়ে বল্লমের খোঁচা মারছে।

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে বই খাতা রেখে খেলার পোশাকটা পরেই মাঠে চলে এসেছে। জলখাবারের কোন প্রশ্নই ওঠেনি—দু' বেলা শুধু খাওয়া, বারে এর চেয়ে বেশি খাওয়ার বিলাসিতার কথা কেউ ভাবতে পারে না।

এখন মাঠ জুড়ে সন্ধ্যা নামছে। পুরনো এ্যালুমিনিয়ামের বাসনের মত খুব ক্ষীণ ম্যাড়মেড়ে একটা আলো রয়েছে। সামনে স্কুলের পরীক্ষা আছে বলে বন্ধুরা সবাই বাড়ি চলে গেছে। জয়ন্ত এখনো লড়ে যাচ্ছে। বলটা নিয়ে ছুটছে একটা চ্যালেঞ্জের ভাব নিয়ে। বুনো শুয়োরের মত গোঁ ধরা নাছোড়বান্দা খিদেটাকে যেন এইভাবে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারবে।

জয়ন্ত একসময় তিনজনকে তিনটে কথা দিয়েছিল। মাকে বলেছিল সে ফার্স্ট ডিভিসনে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করবেই। লেখাপড়ায় ওর মাথাটা ভাল। অল্প পড়লেই কাজ হয়; রাতদিন বইতে মুখ গুঁজে থাকতে হয় না। ফুটবল শিক্ষক, ওর জীবনের ফ্রেণ্ড ফিলজফার এ্যাণ্ড গাইড বেচুদাকে বলেছিল, লোক্যাল লীগের খেলায় সে এমন খেলবে, যাতে ইণ্টার ডিস্ট্রিক্ট টুর্নামেণ্টে দল গড়ার সময়, তার নাম বাদ দেবার কথা কেউ যেন ভাবতে না পারে। আর স্থানীয়

এক রাজনৈতিক দাদাকে কথা দিয়েছিল, কলকাতার এরিয়ান দল যখন প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে আসবে সে খেলায় সে একটা গোল দেবেই। একটা গোলের পুরস্কার হিসাবে হায়ার সেকেণ্ডারির রেজাল্ট বেরোলে কলেজে ভর্তি হবার যাবতীয় খরচ সেই রাজনৈতিক দাদা দেবেন।

এই তিনটি প্রতিশ্রুতিই সে ভালোভাবে রাখতে পেরেছিল। বিশেষ করে শেষ প্রতিশ্রুতিটি রাখতে পারার জন্যই তার জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছিল। কলকাতার আসার সুযোগটা তৈরি হয়েছিল। তবে জয়ন্ত সঙ্গে সঙ্গে আসেনি, আরো দু' বছর পরে বি এ পার্টওয়ান পরীক্ষা দেবার পর কলকাতা এসেছিল।

দিনগুলো যখন চলে যায়, একসঙ্গে মিলে মিশে মাস বছরে পরিণত হয়, তখন তার অনুভূতিগুলোকে আর পৃথক করে চিনে নেওয়া যায় না সহজে। জয়ন্তর কাছে একবার এক ক্রীড়া সাংবাদিক এসেছিল —জয়ন্তর ছেলেবেলা, ফুটবল জীবনের সংগ্রামময় ইতিহাস সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করে জেনে নিচ্ছিল। খুব অস্বস্তি হচ্ছিল জয়ন্তর, বুকের অনেক গভীরে একটা দুঃখের অন্তঃসলিলা নদী আছে, সেটার খোঁজ সে কী করে দেবে অন্যকে? কলকাতায় আসার পর দুবছরের দুটো ক্লাব বদলানোর মধ্যেই জয়ন্তর খ্যাতি ছড়াতে শুরু করছিল। তারপর থেকে এই বিগ ম্যাচের অবিশ্বাস্য ভূতুড়ে গোলটা হওয়ার আগে পর্যন্ত ইতিহাস খালি এগিয়ে যাবার, সুখকর। কিন্তু জয়ন্ত শুধু একাই জানে, অনেক অপমান, লজ্জা আর প্রচণ্ড যন্ত্রণাকর একটা খিদে তাকে পাগল করে দিয়েছে বারবার। একটা জীবনেই এক মুখচোরা লাজুক ছেলে অনেক দুঃখকে চিনেছে।

রঞ্জুর কথায় চমক ভাঙল জয়ন্তর, 'তাড়াতাড়ি চা-টা শেষ করুন। গাড়ি আসার সময় হয়ে গেছে।' জয়ন্ত একটা বড় করে শ্বাস ফেলে হাতের আধ খাওয়া চায়ের ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিল। 'রঞ্জু! তুমি ফুটবলটা মন দিয়ে চালিয়ে যাও।' সুরঞ্জন খুব আগ্রহের সঙ্গে বলল, 'আপনার মনে হয় আমার হবে? জয়ন্ত খুব অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, 'হবে। নিশ্চয়ই হবে।'

সিগন্যাল দেখে বোঝা গেল ট্রেন আসার সময় হয়েছে। ওরা মোরাম বিছানো পথ ধরে এগিয়ে গেল। জয়ন্ত হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'রঞ্জু! তোমার ঘরের দেওয়ালে আঁটা ছবিটা—প্লিজ—প্লিজ—তুমি ছিঁড়ে ফেলো।' বলার সময় জয়ন্ত মুঠো করে সুরঞ্জনের হাতটা ধরে ঝাঁকাচ্ছিল, গলার স্বর কাঁপছিল থর থর করে। জয়ন্তর মনে হচ্ছিল উচ্চারণের সময় কি একটা অবলম্বনের অভাবে স্বরগুলো পিছলে যাচ্ছে বারবার।

ঠিক সেই সময় ট্রেনটা বিচিত্র আওয়াজ করে প্ল্যাটফর্মের ভেতরে ঢুকে পড়ায় সুরঞ্জনের জবাবটা আর স্পষ্ট শোনা গেল না। ট্রেনের ওপর বেশ কিছু লোক একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তাদের মধ্যে একটি ছেলে, বছর চব্বিশ বয়স, হঠাৎ চেনা মানুষ দেখে যেভাবে মুখ ঘোরায় ঠিক সেভাবে পেছন ফিরে বলল, 'আরে জয়ন্ত মিত্র না?' জয়ন্ত ধরা পড়ে যাওয়া চোরের মত ছিটকে সরে এলো। কুঁকড়ে গিয়েছিল, পর মুহূর্তেই আনন্দ হল লোকে তাকে চিনেছে। এ ব্যাপারটা জয়ন্তকে এতক্ষণ মনের গভীরে কাঁটার মত বিদ্ধ করে রক্ত ঝরাচ্ছিল। এখন এ অবস্থায় চিনে ফেলাতেই বিপদ, কিন্তু একেবারে না চেনার মধ্যেও অগৌরবের বিষয় আছে।

যে ছেলেটি চিনতে পারল সে একা, আর তার আশেপাশের লোকেরা, হয় ততটা ফুটবল সচেতন নয়, কিংবা তারা কেউই সেই ছেলেটির স্বগতোক্তিতে কান দেয়নি, তাই জয়ন্তকে নিয়ে কোন কৌতূহল, ক্রোধ বা বিরক্তির প্রকাশ লোকজনের মধ্যে ঘটল না।

ছেলেটি যে কামরায় উঠেছে, সেটা বাঁচিয়ে আরো দুটো কামরা বাদ দিয়ে জয়ন্ত উঠল। কামরায় বসার জায়গা নেই, দু'চারজন দাঁড়িয়ে আছে। জয়ন্ত ঘোলাটে জামাকাপড় পরা কয়েকটি গ্রাম্য চেহারার লোকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওদের দলপতি গোছের একজন নিজেদের মধ্যেই খানিকটা ঠেলাঠেলি করে জয়ন্তকে বসার জায়গা করে দিল।

বেশ কিছুদিন পরে প্রকাশ্যে বেরিয়ে জয়ন্ত স্বাভাবিক কারণেই

বাইরের লোকজনের সম্বন্ধে একটু সন্দিগ্ধ। বসতে দেবার পর মোটাসোটা চেহারার দলপতি বা যেই হোক, সে যখন জিগ্যেস করল, 'মহাশয়ের কদ্দূর যাওয়া হবে? কাজকর্ম কোথায় করা হয়?' ইত্যাদি তখন খানিকটা নিশ্চিন্ত হল সে। আর যাই হোক জয়ন্ত মিত্রর অস্তিত্ব তাদের জানাশোনার বাইরে।

ট্রেনের কামরায় মাথা নিচু করে বসে থাকতে থাকতে জয়ন্ত মনের মধ্যে একসময় স্পষ্ট মাঠের কোলাহল শুনতে পেল। দল মাঠে নামছে—গোলের মুখে বল গেছে—একটুর জন্য বলটা গোলের দিকে যেতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল—একটা নিশ্চিত গোল শেষ মুহূর্তের তৎপরতায় ব্যর্থ হয়ে গেল—কখনো চিৎকার উল্লাসের, কখনো ক্রোধের, কখনো কয়েক হাজার লোকের সমবেত দীর্ঘশ্বাসের। আর একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা—দু'পক্ষের সব কটা লোক একসঙ্গে বোবা হয়ে গিয়েছিল বিস্ময়ে। একদল ক্রোধ আর অপর দল উল্লাসে ফেটে পড়ার আগের মুহূর্তটা সিনেমার ফ্রিজ শটের মত।

জয়ন্তর চোখে জল না থাকলেও একটা ফোঁপানির মত শব্দ হয়ত মুখ থেকে বেরিয়েছিল, পাশে বসা লোকটি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল। ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গিয়ে নানা ধরনের আবেগ প্রবল হয়ে উঠছে। জয়ন্তর ঠোঁটের তির্যক অবস্থান আর লম্বা হয়ে আসা চোয়াল দেখে সেই গেঁয়ো লোকটি সহজেই বুঝে গেল, শার্টপ্যান্ট পরা নির্ভেজাল শহুরে মানুষটার বুকের মধ্যে একটা কিছু বেদনা জেগেছে।

ফুটবলারের খ্যাতিটা পাগলা তেজী ঘোড়ার মত। কিছুতেই পিঠের ওপর সুস্থির হয়ে জাঁকিয়ে বসতে দেয় না। সর্বক্ষণ ঝটকা দিয়ে সওয়ারিকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা। শক্ত হাতে বলগা ধরে, কায়দা কানুন করে যতক্ষণ ঘোড়ার পিঠের ওপর নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারবে, ততক্ষণ শুধু 'গুরু! গুরু!' রব শুনে যাবে।

কি একটা স্টেশন আসে। হুড়মুড় করে অনেক লোক নেমে যায়। ওঠে অল্প। জয়ন্ত তাদের দিকে একবার উদাসভাবে তাকায়। অফিসের ম্যানেজারবাবু লোকটা যে ঠিক কি ধরনের অপদার্থ, পাজি ও ব্যক্তিত্ব-

হীন ; তাই নিয়ে গোটা চারেক লোক সরবে আলোচনা করে। জয়ন্ত আলস্যে হাই তোলে। ভালো লাগে না, কিছু ভালো লাগে না। বেহালায় ছড় টেনে যাচ্ছে মনের মধ্যে কোন্ যাত্রার ব্যায়লাদার। এক্ষুণি বুঝি বিবেকের গান দিয়ে শুরু হবে এক বিষাদময় পালা কাহিনী।

নিজের রংচটা টুটা ফাটা জামা প্যাণ্টগুলোও বেশ যত্ন করে, ফিটফাট হয়ে পরত জয়ন্ত। বাবা স্কুলের কেরানী তখন, এখন ফুটবলার জয়ন্তর বাবা, বুক পকেটে বিশ টাকা নিয়ে বাজার যান। সে সময় মালদা টাউনের একটা ছোট্ট ঘরে বাবা মা আর তিন ভাই বোনের আস্তানা। ছোট বোনটা তখন এইটুকুন। সে সময়কার কথা মনে পড়লেই অদ্ভুত একটা অপরাধ বোধে ওর মনটা কুঁকড়ে যায়।

বাড়িতে মোট আধ সের দুধ আসতো। তা দিয়ে চা হতো, ছোট বোন রুমা খেতো, আর মা ওর থেকেই একটু বাঁচিয়ে রুটি দিয়ে মেখে খাবার জন্য জয়ন্তকে দিত। তখন খিদের বোধটা এত তীব্র, যন্ত্রণাদায়ক ও ক্লান্তিকর ছিল যে ও দুধ দিয়ে মাখা রুটিগুলো গোগ্রাসে গিলে ফেলত।

রুমাটা চিরকালই রোগা পাতলা, ম্যাল নিউট্রিশনে ভুগলে যা হয়। ও বড় হয়েও বদলাল না। জয়ন্তর মনে হয় শিশুর দুধে অন্যায়ভাবে ভাগ বসিয়েছিল, তাই রুমার শরীরের স্বাভাবিক বাড়টা হল না।

দুধ খাওয়ার কথাটা মা-বাবা কিম্বা ভাইবোনেরা কেউই হয়ত মনে রাখেনি। রুমার তখন তো জ্ঞানই হয়নি। আর তাছাড়া এক দেড় হাতা দুধের ঘাটতিতেই সমস্ত কিছু ওলোট পালোট হয়ে গেছে, এ চিন্তাটাও ঠিক নয়। তবু কাঁটাটা ঠিকই বেঁধে।

রুমাটা হয়েছেও ওর দাদার ভারী ন্যাওটা। যতক্ষণ জয়ন্ত বাড়িতে থাকবে, গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকবে প্রায়। ওইতো রোগা হাড় জিরজিরে শরীর, কিন্তু ওই জীর্ণ দেহ খাঁচাটার মধ্যে কি অপরিসীম প্রাণশক্তি, দেখলে তাজ্জব বনতে হয়। সব সময় উৎসাহে, উদ্দীপনায়, চাঞ্চল্যে টগবগ করছে। রুমা যদি জানত ওর দাদা এভাবে মার খেয়েছে, তাহলে কি করত কে জানে?

জয়ন্ত যখন কলকাতায় ব্যাঙ্কে চাকরি পেল বড় ক্লাবে খেলার দৌলতে, এছাড়াও ক্লাব থেকে বাড়তি টাকা পেল অনেকগুলি, তখন উত্তেজনায় ক'রাত্রি ও ঘুমোতে পারেনি। খালি মনে মনে অঙ্ক কষেছে, ক'টাকায় কতটা সুখ কেনা যায়? এ বাড়ির সকলের চোখই ছায়াময়, ভয়ের ছায়া পড়েছে। না পেয়ে পেয়ে চাইবার ক্ষমতাটাও হারিয়ে ফেলেছে। জয়ন্ত ঠিক করেছিল অভাব অনটন এই সংসারের মধ্যে যে বিশ্রী গভীর কালো খাদগুলো সৃষ্টি করেছে, সেগুলো ভরাট করাটাই হবে তার প্রথম কাজ। ভরাট কতদূর কি হয়েছে কে জানে? কিন্তু মালদার বাড়ির তুলনায় কলকাতার ফ্ল্যাট স্বর্গের চেয়েও কিন্তু বেশি।

বহুদিনের তীব্র যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেলে একটা স্বস্তির ভাব আর তার সঙ্গে এতদিনের যন্ত্রণা ভোগের ক্লান্তি মিলেমিশে যেমন একটা ছাপ পড়ে মুখে, জয়ন্ত তার মাকে দেখলে তেমন মনে হয়। বাবার একটাই পরিবর্তন, আগে কোনরকম খেলার ধার ধারতেন না। এখন ফুটবল তো বটেই, ক্রিকেট, হকি নিয়েও বিশেষজ্ঞের মত মতামত দিতে ছাড়েন না। খেলা থাকলে জয়ন্তর কাছে ডে স্লিপ চেয়ে নিয়ে পাড়ার ছেলেদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেন। পাড়ার ছোটদের মধ্যে বাবার একটা বড় রকম জনপ্রিয়তা আছে। ভইটা মস্তান মত হয়েছে। একটু বাবু ধরনের, না হলে ওরও খেলাধূলা হত।

জয়ন্তর চিন্তায় হঠাৎ ছেদ পড়ল। স্টেশনে গাড়ি এসে থেমেছে। কয়েকটা ছেলে গাড়িতে উঠেই জয়ন্তকে চিনতে পেরেছে। 'এই দ্যাখ. মাইরি! জয়ন্ত মিত্তির না?'

নিজের নাম শুনে স্বাভাবিকভাবেই মুখ তুলে চাইতে গিয়েও থমকে গেল! ও জানলার দিকে তাকিয়ে বসে রইল। ভাবখানা ছেলেগুলো যাকে জয়ন্ত মিত্র বলে ভাবছে, সে তা নয়। ওরা আরো দু'একটা কথা কী বলাবলি করল। জয়ন্ত একই ভাবে উদাস হয়ে জানলা দিয়ে তাকিয়ে বাইরের মাঠঘাট দেখতে লাগল।

একসময় জয়ন্তর পাশে বসা সেই মোটাসোটা চেহারার মোড়ল গোছের ভদ্রলোক জয়ন্তর গায়ে ঠ্যালা দিয়ে বললেন, 'আপনাকে কী

বলছে। আপনি কি জয়ন্ত মিত্র ?' বলার ধরণটা এমন, মনে হচ্ছে যেন উনি কোন ফেরারী আসামীকে সনাক্ত করতে পেরেছেন।

—'দ্যাখ্ দ্যাখ্, বাঁদিকের পকেটটা কেমন ফুলে উটেছে। ঘুসের টাকাগুলো বোধহয় সব ওখানেই রেখেছে।'

—'তোদের তো দুঃখ করার কিছুই নেই, নিজের গোলে বল ঢুকিয়ে তোদের তো জিতিয়ে দিয়েছে।'

যাকে বলা হল সে ছেলেটা খিক্ খিক্ করে হাসল। ওদের মধ্যে একজন জয়ন্তর কাছাকাছি এসে বেশ বিনীতভাবে বলল, 'দাদা যদি দয়া করে আমাদের চারজনকে দশটা টাকা দেনতো একটু সিনেমা দেখে ফূর্তি করি। সেদিন আপনার সেমসাইড গোলে টিম হেরে যাবার পর থেকে মনটা একেবারে ড্যাম্প মেরে গেছে। হেমামালিনীর নাচ দেখে একটু চাঙ্গা করে আসতাম।'

কামরায় এতক্ষণ জয়ন্তকে কেউ চিনতে পারেনি, কিন্তু খেলার মাঠে অঘটন, এই হিসাবে জয়ন্তর দেওয়া সেমসাইড গোলের দারুণ একটা নিউজ ভ্যালু ছিল। তার ফলে খবরটা সকলের জানা। সেদিনের নাটকের খল নায়ককে হঠাৎ নিজেদের মধ্যে আবিষ্কার করে সকলে বেশ নড়েচেড়ে বসল। সকলে একসঙ্গে হৈহৈ করে উঠল। একসঙ্গে সব কটা চোখ ওর দিকে। টিটকারির ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ওদের মধ্যে এক ফর্সা রোগাটে চেহারার বৃদ্ধ সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বেশ সাংবাদিক সুলভ বিজ্ঞতায় বলল, 'দাদা, ব্যাপারটা সেদিন যে ঠিক কী ঘটল! আই ওয়াজ প্রেজেণ্ট দেয়ার।'

জয়ন্ত বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের মুঠি দিয়ে জোরে একটা ঘুসি মেরে বলল,—'অ্যাক্সিডেণ্ট! অ্যাক্সিডেণ্ট !!'

সেই শুনে অনেকগুলো লোক হো হো করে হেসে উঠল। জয়ন্ত একবার তাদের দিকে ঘোলাটে চোখে তাকাল, তারপর তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, চেঁচিয়ে বলল,—'স্টপ! স্টপ !! স্টপ !!!' জয়ন্তকে ক্লাউন ভেবে আরো জোরে সবাই হাসল। জয়ন্ত অন্ধ ক্রোধে লক্ষ্যহীন ভাবে একটা ঘুসি ছুঁড়ল—লাগলো না কারো গায়ে। কিন্তু অন্তত দশ

জোড়া হাত সুযোগ পেয়ে আছড়ে পড়ল জয়ন্তর শরীরে।

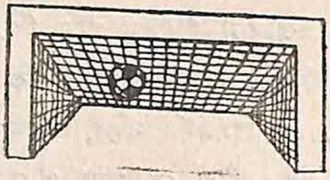
প্রহারের পুরনো স্মৃতিটা জয়ন্তর মনে বিদ্যুৎ চমকের মত খেলে গেল। আর ও মুহূর্তে নিজেকে গুটিয়ে নিল—এক দল কুকুরের কাছে একটি কুকুর যেভাবে আত্মসমর্পণ করে, জয়ন্তকে দেখে অনেকটা সে রকম মনে হচ্ছিল। আর ঠিক সে সময় পাশে বসা মোড়ল গোছের লোকটি, তার বিরাট শরীরটা দিয়ে জয়ন্তকে আড়াল করে দাঁড়াল। ওর সঙ্গীরাও সব একসঙ্গে উঠে করজোড়ে সকলকে বলতে লাগল, 'ক্ষমা করুন! ক্ষমা করুন!' ওদের স্বর আবেগে উত্তেজনায় কাঁপছিল থরথর করে। দু'একজনের চোখে স্পষ্ট জলের রেখা। এইসব দেখে ট্রেনের কামরার মারমুখী লোকগুলো অন্যরকম হয়ে গেল। প্রত্যেকের রাগী রাগী মুখের চেহারাটা বদলে গিয়ে সেখানে একটা ভাব হীন শীতলতা এলো।

জয়ন্ত মুখ তুলে অবাক হয়ে দেখল, ঘোলাটে জামাকাপড় পরা লোকগুলোর প্রত্যেকের চোখের কোণ জলে চিক চিক করছে। বিড় বিড় করে বলছে, 'রাধা মাধব···রাধা মাধব···।' জয়ন্ত দেখল ওদের সকলের গলায় বৈষ্ণবের কণ্ঠী, কপালে চন্দনের ফোঁটা।

মোড়ল গাছের লোকটি জয়ন্তর পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বলল, 'মশাই-এর যাওয়া হবে কতদূর?'

জয়ন্ত বলল, 'জানি না।' একথায় লোকটি কী বুঝলেন কে জানে, জয়ন্তকে বললেন, 'আমরা সামনের স্টেশনে নামবো। আপনিও আসুন। আমাদের বৈষ্ণবের আখড়া। রাধা মাধবের দাস আমরা, অন্য কোথাও যাওয়ার তাড়া না থাকলে দু'দিন কাটিয়ে যান আমাদের সঙ্গে।'

জয়ন্তকে এর বেশি বলতে হল না, ও রাজি হয়ে গেল। প্ল্যাটফর্মে গাড়ি এসে দাঁড়াতে জয়ন্তর ব্যাগটা বৈষ্ণবদের একজনই নামিয়ে নিয়ে এল। কামরার লোকগুলো অবাক বিস্ময়ে জয়ন্ত আর বৈষ্ণবদের দিকে তাকিয়ে রইল।



ট্রেনের ঘটনাটার পর দিন দুয়েক ভয়ে ভয়ে কাটল জয়ন্তর। ট্রেনে মারমুখী জনতার হাত থেকে তাকে যারা বাঁচিয়েছিল, তাদের সঙ্গে এসে বৈষ্ণবের আখড়ার শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে জয়ন্ত নিজেকে একটু সুস্থির করে নিল।

গ্রামের মধ্যিখানে সুন্দর পরিবেশ। খড়ের ছাউনি দেওয়া সারবন্দী ঘর। চারদিকে বেশ গাছপালা, সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া যায়, এমন মসৃন ঝকঝকে মাটির উঠোন। মাধবীলতা আর লতানে যুঁইয়ের মিষ্টি গন্ধ। রাধা-মাধবের মন্দিরটা একমাত্র ইঁট সিমেণ্টের তৈরি। চারবেলা নিরামিষ আহার ছাড়া অস্বস্তির কিছু নেই। আখড়া বা তার আশেপাশের লোকেরা ফুটবল বা জয়ন্ত মিত্র সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র উৎসাহী নয়। জয়ন্ত ভেবে ছিল এখানে কিছুদিন কাটিয়ে দেবে। কিন্তু দ্বিতীয় দিন রাত্রেই নবদ্বীপ থেকে এক দঙ্গল বৈষ্ণব ভক্ত এসে উপস্থিত হল। স্থান সংকুলান হওয়া মুশকিল, তবে জয়ন্তকে কেউ কিছু বলেনি, সে নিজে থেকেই পরদিন সকালে চলে যাবে বলে ঠিক করল।

ওকে এখানে আসার কথা যে বলেছিল, সেই ট্রেনের দলপতি গোছের ভদ্রলোকের নাম বৃন্দাবন দাস। জয়ন্ত পরদিন ভোরে তাকে সেই খবরটা দিতে, তিনি মোহান্তের কাছে ধরে নিয়ে গেলেন। মোহান্ত বিড়বিড় করে কী একটা স্বস্তিবচন আওড়ালেন, তারপর হাসিমুখে বললেন, 'যাত্রাপথ শুভ হোক।'

ওরাই একটা সাইকেল রিক্সার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, সেটা চেপে শহরে আসার পর জয়ন্ত খুঁজে পেতে একটা সানগ্লাস কিনল। জিনিসটা ঠিক পছন্দসই নয়, তবে যে কাজের জন্য কেনা সেটা সফল হবে মনে হল। পাশের দোকানে ছিটের জামা বিক্রি হচ্ছিল। জয়ন্ত ইচ্ছে করেই

একটা বিশ্রী সবুজ রঙের চৌখুপী সার্ট কিনল। তিনদিন দাড়ি কামানো হয়নি। স্টেশনে গিয়ে ওয়েটিং রুমে সার্টটা বদলে নিল, চোখে কালো চশমাটা পরল, গলায় রুমাল বাঁধল একটা, চুলটা ফিরিয়ে আঁচড়ালো আন্দাজে। তারপর পানের দোকানের আয়নায় গিয়ে যখন নিজেকে দেখল, তখন নিজেরেই চিনতে কষ্ট হচ্ছিল।

ছদ্মবেশটায় খুশী হয়ে জয়ন্ত হাওড়া যাওয়ার টিকিট কিনল। ট্রেনে কোন গণ্ডগোল হল না, হাওড়ায় পৌঁছে জয়ন্ত ঘড়ি দেখল ১১টা ২৮। স্টেশন থেকে বেরিয়ে ফুটপাথের ভাতের দোকানে বেশ তৃপ্তি করে ভাত, ডাল, মাছের ঝোল খেল। তারপর ব্রিজ পেয়িয়ে হাঁটা পথেই ডাল-হাউসিতে পৌঁছে গেল। উল্টোদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে নিজের কর্ম-স্থলটির দিকে মিনিট পাঁচেক তাকিয়ে রইল। ব্যাঙ্কের লোকজন ঢুকছে বেরোচ্ছে। গেটের সামনে টোটার মালা বুক জড়িয়ে, বন্দুকটা হু'হাঁটুর মাঝখানে রেখে ঝিমোচ্ছে দারওয়ান ব্রিজলাল।

জয়ন্ত রাস্তা পেরিয়ে সদর দরজা এড়িয়ে পাশের খিড়কি দিয়ে ভেতরে ঢুকল। প্রথমেই মুখোমুখি হল ডেসপ্যাচের সন্দীপ মণ্ডলের সঙ্গে। অবাক হয়ে হাঁ করে খাবি খেল প্রথমে, তারপরে ফিক করে হেসে বলল, 'ভালো আছেন? এ কি চেহারা হয়েছে আপনার?'

সন্দীপকে অবাক বিস্ময়ের মধ্যে ফেলে রেখে জয়ন্ত পাশ কাটিয়ে দোতলার সিঁড়ি ধরে উঠে এল। লম্বা টানা বারান্দা। ও দেখল যোগনাথ বাথরুম থেকে বেরিয়ে ডিপার্টমেণ্টে যাচ্ছে। জয়ন্ত অল্প চেঁচিয়ে ডাকল, 'যোগো'। পরিচিত গলা শুনে পেছন ফিরে তাকিয়ে, বারান্দার আধো অন্ধকার পরিবেশে জয়ন্তকে চিনে নিতে যোগনাথের একটু সময় লাগলো। দুজন একই দলে খেলে এখানেও সহকর্মী। যোগো প্রায় ছুটে এল, 'জয়ন্ত তুই!'

দোতালার বারান্দা এমনিতেই ফাঁকা থাকে। তাই ওদের দুজনকে লক্ষ্য করার মতন কেউ ছিল না। যোগো ওর বাঁ-পাশের একটা ঘরের পর্দা সরিয়ে দেখে নিয়েই জয়ন্তকে প্রায় ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে নিল। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মজুমদারের ঘর। মজুমদার এখন ঘরে নেই। লাইট

পাখা নেভানো নেই, মনে হয় এক্ষুণি ফিরবে। সে দিকে ওদের দু'জনের কারোরই নজর দেবার কথা মনে পড়ল না।

জয়ন্ত খুব ক্লান্তভাবে একটা চেয়ারে বসে পড়ল, যোগো তার বিশাল ছ'ফুট দু'ইঞ্চি চেহারা নিয়ে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দু'জনের কারোর মুখে কথা নেই। এ অবস্থায় প্রায় মিনিট দু'তিনেক কাটল। তারপর যোগো-ই প্রথমে কথা বলল, জয়ন্ত তাহলে তুই কী করবি ?'

—'ক্লাবের অবস্থা কী ? বাড়ি ফেরা যাবে ?'

যোগো প্রায় আঁতকে ওঠার মত করে বলল, খবরদার জয়ন্ত! বাড়ি যাওয়ার নাম মুখে আনিস না। খুব নাকি একচোট হুজ্জুত হয়ে গেছে। মাসিমাদের তো অন্য জায়গায় সরিয়ে দিতে হল।'

জয়ন্ত গোঁজ হয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বুক ঠুকে গোঁয়ারের মত বলল, 'আমি দোষ কিছু করিনি, যেটা হয়েছে, সেটা অ্যাক্সিডেন্ট। বাড়ি আমি যাবই।'

—'যেতে পারতি, যদি ক্লাবের সাপোর্ট থাকত।'

ক্লাবের কথায় জয়ন্ত মুখে কিছু না বলে একটা অভিমানী দৃষ্টিতে যোগোর দিকে তাকাল।

—'তোকে ছোট্টুদা শেলটার দিয়েছিল। ফুটবল সেক্রেটারিই তেমন বলেছিল। তার দু'দিন পরে ক্লাবে জেনারেল বডির মিটিং হল। ছোট্টুদা—।'

—'থামলি কেন, বল ?' জয়ন্তর গলা উত্তেজনায় কাঁপছে।

—'না নাম বলব না। আমার ইনফরমেশনে ভুল থাকতে পারে, কানা-ঘুষোয় শোনা খবর। সে মিটিং-এ কেউ একজন খুব জোর গলায় চেঁচিয়ে বুঝিয়েছে, তুই নাকি—।' আবার কথা আটকে গেল যোগোর।

জয়ন্ত কপালের ওপর পড়া চুলের গোছাকে জায়গামত ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'হুঃ। ঘুস খেয়েছি বলছে, হ্যাঁরে যোগো, প্লেয়ারদের তোরা বিশ্বাস করিস ?'

যোগো একটু থতমত খেয়ে বলল, 'আমাদের বিশ্বাস অবিশ্বাসে কি আসে যায়।' তারপর একটু ঢোঁক গিলে জানাল, সেক্রেটারির

বাড়িতে হামলা হয়েছে টানা এক হপ্তা ধরে। মাইরি আমাদের পর্যন্ত লোকে টিককিরি দিচ্ছে।'

জয়ন্ত বেশ কঠোর গলায় বলল, 'দল হারায় এর আগে কখনো টিটকিরি খাসনি ? নাকি এবারে আমার সেমসাইড গোলে দল হেরেছে বলে তোরা সব গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসী পাতা হয়ে গেলি ? তোরা অতই যদি ভালো খেলিস, সবাই মিলে একটা গোল শোধ করতে পারিসনি কেন ?'

—'ত্যাখ জয়ন্ত, ফালতু বাতেলা দিবি না। আমি তোর বন্ধু, তোর ওয়েল উইশার। তোর যাতে ভালো হয়, তাই বলছি।—জানিস পি. সি. ঘোষ কি বলেছে ? খেলার আগেরদিন বেলা বারোটায় একটা ভূতুড়ে ফোন এসেছিল। সেই ফোনেই নাকি বলেছিল, তোকে মাঠে না নামাতে। তুই নিজেকে যতটা ইনোসেন্ট বলে জাহির করতে চাইছিস, তা তুই নোস।'

—'বাঃ! চমৎকার! ছোট্টুদা তো খেলার আগে থাকতেই আমাকে কনফাইনমেণ্টে রেখেছিল।'

—'ছোট্টুদাই বলেছে, খেলার আগেরদিন সন্ধ্যায় তুই তার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া করেছিলি। তুই ফোন করে অপোনেণ্ট টিমের কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছিলি ?'

—'যোগো তুই সম্ভব অসম্ভব বিচার করে কথা বল। যদি সত্যিই বিপক্ষের কারোর সঙ্গে কথা বলতে চাই, তবে কি তা ছোট্টুদাকে জানিয়ে করব ?'

—'না তুই বাড়িতে ফোন করতে চাইছিলি। ছোট্টুদা তোর কথা শুনে বুঝেছে, তোর আসল মতলবটা কী ছিল।'

জয়ন্ত হতাশ হয়ে চুপ করে গেল। বুঝলো বৃথা তর্কে ফল নেই। সে মুহূর্তে নিজেকে বড় অসহায় মনে হচ্ছিল। যোগো জয়ন্তর কাঁধে হাত রাখল, জয়ন্ত ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে দিল।

যোগো বলল 'তুই সত্যি করে বল শতদলদার সঙ্গে তুই দেখা করিসনি ?

জয়ন্ত দিশেহারার মত বলল, 'দেখা করেছি? ছোট্টুদা যেদিন আমাকে মাঠ থেকে নোনাতলার বাড়িতে অজ্ঞাতবাসে নিয়ে এল, সেদিন—।'

—হ্যাঁ, সেদিন, পথে গাড়ি থামিয়ে ছোট্টুদা দু' মিনিটের জন্য একটা ওষুধের দোকানে ঢুকেছিল, বেরিয়ে এসে দেখে তুই শতদলদার সঙ্গে গল্প করছিস।'

বলার সময় যোগোর চোখটা ছোট ছোট হয়ে, তাতে একটা কুটিল আবেশ সৃষ্টি করল। জয়ন্ত দিশেহারা হয়ে বলল, 'তোরা ব্যাপারটাকে একটা বাজে কালার দেওয়ার চেষ্টা করছিস। ছোট্টুদা গাড়ি থেকে নামলে আমিও নামলাম। ছোট্টুদা ফ্র্যাঙ্ক রসের দোকানে ঢুকে গেল, আমি ফুটপাথটায় পায়চারি করছিলাম, এমন সময় শতদলদার সঙ্গে দেখা। হ্যাঁরে—তুই কথা বলতিস না সে সময়!'

—হ্যাঁ বলতাম। কিন্তু তোর সঙ্গে একটু অন্য ধরনের কথা হয়েছিল। ছোট্টুদা যখন পেছনে এসে দাঁড়ায়, তখন শতদলদা তোকে গ্র্যাণ্ডে নিয়ে যেতে চাইছিল।'

—'হ্যাঁ। শতদলদা বলছিল, আজ আমার পকেটে অনেকগুলো টাকা আছে। চল জয়ন্ত, একটু লাক্সারি করে আসি।' সত্যি সত্যি নয়, এমনি হাসি ঠাট্টা করে বলা কথা।'

চোখ আর ঠোঁট কুঁচকে যোগো এমন একটা মুখের ভাব করল, সেই ক্রূরতার কাছে জয়ন্ত আপনিই গুটিয়ে এল।

'জয়ন্ত তোকে অপনেণ্ট টিম ইলোপ করতে চেয়েছিল। আমার কাছেও অফার এসেছিল। আরো দু'একজনের কাছেও—তটা বেইমানী করতে মন ওঠেনি।'

জয়ন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'যোগো!' ওর ক্রোধটা একটা শীর্ষে পৌঁছবার পর, কান্না হয়ে ঝরে পড়ল। ও খুব নিঃশব্দে ফোঁপাচ্ছিল, সারা শরীরটা কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। 'যোগো তোরা আমাকে এভাবে অবিশ্বাস করিস্ না।'

—'তোর জন্য অন্য প্লেয়ারদের প্রেস্টিজ চলে গেছে ক্লাবে। পি. সি

ঘোষ তো সেদিন সকলকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলল, পাঞ্চাশ-ষাট হাজার করে টাকা একেকজন পায়, তারপরও যদি ক্লাবের প্রতি এই লয়্যালটির নমুনা হয়··· ।'

জয়ন্তর বোধের কেন্দ্রটি যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। যোগোর বলা কথাগুলো ওর মগজে গিয়ে কোনরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারছে না।

এ সময় জুতো মশ্‌মশ্‌ করে মজুমদার ঘরে ঢুকল। ওদের দুজনকে ঘরে দেখে প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল, তারপর ঝাঁকড়া গোঁফের ফাঁক দিয়ে হাসির ঝিলিক খেলে গেল।

'জয়ন্তর এ কী চেহারা। এ কী বেশবাস! তোমাকে এখন যা দেখাচ্ছে, ঠিক তেমন একটা লোককে পকেটমারের জন্য আমি ঠেঙিয়েছিলাম।'

মজুমদার আশা করেছিল ওর এ কথায় সবাই হাসবে, প্রত্যাশিত ফল না হওয়ায় বলল, 'ও তোমরা বুঝি কোন সিরিয়স টক করছো? ঠিক আছে, তোমরা নিরিবিলিতে কথা বলো, আমি আসছি।' বেরিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'জয়ন্ত তুমি কি অফিসে জয়েন করছো? ছুটির আরো দরকার থাকলে নিতে পারো। যাই হোক আজ এসেছো যখন, একটা দরখাস্ত দিয়ে যেও।' কথা কটা বলে হন্ হন্ করে চলে গেল মজুমদার।

আবার দু'জনে মুখোমুখি। জয়ন্ত একটা চেয়ারে বসে আছে, যোগো উঠে দাঁড়িয়েছে ডান হাতটা মুঠি করা। পেশীগুলো ফুলে উঠেছে, মনে হচ্ছে ক্রোধ চাপার চেষ্টা চলছে প্রাণপণে।

জয়ন্ত নিজেকে সামলে নিয়েছে ততক্ষণে। বাঁ হাতের চেটো উল্টো করে চোখের জল মুছে যোগোর দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল। তারপর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। যোগো একটু ইতস্তত করে হাতটা ধরল।

—'যোগো তুই আমার বন্ধু। একসঙ্গে অনেকদিন খেলেছি। আমি তোর সঙ্গে কিছুতেই ঝগড়া করব না।

যোগো থম্ মেরে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ও যা করল, সেটাকে

একমাত্র নাটকীয় আখ্যা দেওয়া যায়। জয়ন্ত কিছু বোঝায় আগেই ও তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

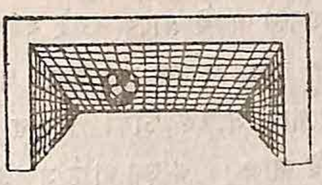
—'জয়ন্ত, বিশ্বাস কর, ক্লাবে সবাই যখন বলল, তুই ঘুস খেয়েছিস্ শুনে আমি প্রথমটা বিশ্বাস করিনি। তারপর সকলে এটা প্রমাণ করার জন্য কনফিডেন্টলি এমন সব যুক্তি খাড়া করতে লাগল—বিশ্বাস কর্ আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলাম। ওরা সব্বাই আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলত। ওরা জানে তুই আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু।....এসব শুনে আমার মাথার ঠিক ছিল না।'

ওরা তু'জন এখন পাশাপাশি চেয়ারে বসে। তু'জনের মুখেই একটা ক্ষীণ হাসির রেখা। জয়ন্ত বলল, 'তোর মনে পড়ে যোগো, তুই আর আমি একই বছরে কলকাতায় খেলতে এলাম, তুই বর্ধমান থেকে আর আমি মালদহ। তুজনেই রাম গাঁইয়া, সব সময় শহুরে হবার প্রানপণ চেষ্টা করতাম।'

যোগো বলল, 'মনে আছে একবার তুই আমি আর সুশান্ত চীনে দোকানে খেতে গিয়েছিলাম। সেই প্রথম ওরকম একটা সাজানো গোছানো রেস্টুরেণ্টে আমাদের যাওয়া। ফ্রিজের ঠাণ্ডা জল দিয়েছিল। তোর আবার গলা ধরা ছিল বলে ঠাণ্ডা জল খাবি না, বেয়ারাকে ডেকে ইংরেজিতে বললি, প্লিজ গিভ মি আ গ্লাস অব ওয়াটার এ্যাট নর্মাল টেম্পারেচার। বেয়ারাটা নতুন ইংরেজি শুনে হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইল।'

—'কি করবো, প্লেন ওয়াটার কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম যে···ওঃ এমন কত ঘটনাই যে রোজ ঘটত তখন।'

যোগো আর জয়ন্ত পাশাপাশি বসে এমন নিবিষ্ট হয়ে গল্প জুড়ে দিল, তা দেখে একটু আগের সমস্ত ঘটনাগুলো অলীক মনে হতে পারে যে কোন লোকের। জয়ন্তর হাবভাব দেখে তখন কে বলবে যে একটা বিশ্রী সমস্যার ক্ষ্যাপা কুকুর তাকে তাড়া করে কামড়ে কামড়ে ছিন্ন ভিন্ন করছে।



যোগো বলল, 'জয়ন্ত, তুই বরং আমাদের বাড়ি চল। ট্যাক্সি ধরে টুক্ করে চলে যাবো। এখন তুপুরবেলা, পাড়াটা নির্জন, কে এল গেল কে আর লক্ষ্য রাখছে। চিলেকোঠার ঘরে আমি থাকি। ঘরের মধ্যে আর একটা খাট ঢুকিয়ে নেব ; তারপর তু'বন্ধু মিলে পাশাপাশি তোফা থাকব।'

জয়ন্ত এ প্রস্তাবটা শুনে বিজ্ঞের মত বার কয়েক মাথা নাড়ল, তারপর বলল, 'ঠিক বলেছিস্ সেটাই ভালো হবে। দাঁড়া ডিপার্টমেন্টে গিয়ে সবার সঙ্গে দেখাটেখা করে আসি, ছুটির ব্যবস্থাটাও তো করতে হবে।'

—'চট্‌পট্ কর। আমি ততক্ষণ ট্যাক্সি ডাকি। আর শোন্··· কাউকে বলিস্ না, তুই আমার বাড়িতে থাকছিস্।'

—'পাগল ! আমি বলবো, আজকের ট্রেনেই ভুবনেশ্বর চলে যাচ্ছি। তুই বরং ট্যাক্সিটা নিয়ে জি. পি. ও-র সামনে ওয়েট কর্। আমি টুক্ করে চলে যাব।'

যোগোর বাড়িতে আসার ঘটনাটা খুবই নির্বিঘ্নে ঘটল, বলতে গেলে কাকপক্ষীটিও টের পেল না। জয়ন্ত দাড়ি কামাল, ক্যাটকেটে সবুজ রঙের বদ্‌খদ্ জামাটা খুলে যোগোর ব্যাংকক থেকে আনা একটা তুধ সাদা রঙের গেঞ্জি আর ড্রাগন আঁকা সিল্কের লুঙ্গি পরল। ব্যাগের মধ্যে নিজের জামাকাপড় ছিল, কিন্তু সেগুলোর চেয়ে এ তুটোই পছন্দ হল বেশি। তারপর এক থালা লুচি আলুর দম আর তুটো রাজভোগ খেয়ে পরম তৃপ্তিতে খাটের ওপর গড়িয়ে পড়ল। যোগো একটা সিগারেট অফার করাতে জয়ন্ত সেটা ধরিয়ে আয়েস করে টান দিয়ে ছাদের দিকে লক্ষ্য করে ধোঁয়ার রিং ছাড়ল।

এই যোগো আর জয়ন্তর ফুটবল কেরিয়ারটা একেবারে অচ্ছেদ্য।

দু'জনেই ফার্স্ট ডিভিসনে একই ক্লাবে একই বছর খেলা শুরু করে। দু'জনেই একই সঙ্গে বার তিনেক ক্লাব বদলে গত বছর থেকে এই ক্লাবে এসেছে। যোগোর সঙ্গেই টাকা পয়সার লেনদেন নিয়ে কথা হয়েছিল, জয়ন্ত তাতেই রাজি। গড়ের মাঠে সবাই জানে, যোগোই জয়ন্তর কনসেন্স কিপার।

যোগো বলল, 'মানিকদাকে কাল নার্সিং হোম-এ দেখতে গিয়েছিলাম।'

—'কেন রে! কী হল?' জয়ন্তর গলায় উৎকণ্ঠার ভাব স্পষ্ট।

যোগো ফিক্ করে হেসে বলল, 'পা ভেঙ্গে গেছে, তবে খুব একটা সিরিয়স কিছু নয়।'

জয়ন্ত যোগোর কথা বলার ধরনে বিরক্ত হল। ও আর কিছু জিগ্যেস না করে খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। শরতের চকচকে রোদ, আর কিছু নীল সাদা মেঘ নিয়ে আকাশ। বর্ষা শেষ হবার পর রোদ্দুরে চাঁপা ফুলের রং লাগলেই এককালে রাজারা দিগ্বিজয়ে যেত, বাণিজ্যে যেত বণিকরা, তীর্থ যাত্রারও এটাই প্রকৃষ্ট সময়। বুকের মধ্যে ছুটির পাখিরা ডানা মেলতে চায়। জয়ন্ত ইচ্ছে করলেই দূর ভ্রমণে যেতে পারে। কিন্তু জয়ন্ত টের পায় একটা অদৃশ্য জেলখানা তাকে ঘিরে রয়েছে। যেখানেই সে যাক জেলখানাটাও সঙ্গে যাবে। রবীন্দ্রনাথের 'ঋণশোধ' নাটকে এক বালক এমনি এক শরতের অপরাহ্নে পুঁথি নকল করে তার পিতৃঋণ শোধ করত। জয়ন্ত তবে কিসের ঋণ শোধ করছে?

জয়ন্তকে অন্যমনস্ক হতে দেখে যোগো ওর গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, 'মানিকদার ব্যাপারটা শোন, বাড়ির সামনে একটা পার্ক আছে না, ছেলেরা সকাল বিকেল ফুটবল খেলে—এখনতো ময়দানের অফ সিজন, মানিকদা তাই পার্কে গিয়ে ছেলেদের খেলা দেখত।' জয়ন্ত হাসতে হাসতে বলল, 'আর উপদেশের ঝর্ণাধারা বইয়ে দিত।' ওঃ মনে আছে, সেই প্রথম বছর কলকাতায় খেলা, মানিকদা সাইড লাইনে বসে সারাক্ষণ ধারাবিবরণী দেবার মত বকবক করে যেত। খেলা চলত,

আর মানিকদার কণ্ঠস্বর চড়ত। জয়ন্ত স্পষ্ট শুনতে পায় চিৎকারগুলো —ম্যান ধর্, চেজ কর্, পুলিস ম্যনে খেলে যা —মানে ক্লোজ মার্কিং-এ খেলা। লব কর, হতভাগা—আর কত এ্যালাও করবি, এবার কম্বল ধোলাই দে—ব্ল্যাঙ্কেট কর। ইস্ এইসব ফার্স্ট ডিভিসনের খেলা ?

একবার মনে আছে জয়ন্তর, দল জিতেছে কোনক্রমে এক গোলে, মাঠ থেকে বেরিয়ে আসতেই মানিকদা তার ওপর হামলে পড়ল, 'ইয়ার্কি পেইচিস্, কেষ্ট ঠাকুরটি সেজে মাঠে খেলতে না এসে, যা না গোঠে গিয়ে বাঁশী বাজা।'

খেলার আগে কপালে কালীবাড়ির সিঁদুরের টিপ পরানোটা রেওয়াজ। মানিকদা দারুণ কালীভক্ত, খেলা থাকলেই নিজে গিয়ে পুজো দিয়ে আসেন। তারপর ভক্তি ভরে প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের কপালে একটা করে পুজোর সিঁদুরের ফোঁটা দেন। খেলোয়াড়টি তারপর বেঁটেখাটো মানিকদার সুবিধের জন্য হাঁটু ভাঁজ করে একটু নিচু হয়ে হাঁ করে, মাণিকদা সেই হাঁ মুখে আলগোছে এক টুকরো প্রসাদী প্যাঁড়া ফেলে দেন।

খেলার দিনের এ নিয়মটা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। মানিকদার দলে জয়ন্ত সেবার নতুন। মানিকদা মাঠে নামার আগে সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়ার সময় রোজ বিড়বিড় করে বলেন, 'বাঘের মত লড়ে যাবি। বড় টিম মেজ টিম বলে ভয় খাবি না। বড় টিম বলে যাদের ভয় পাচ্ছিস, তার গণ্ডাখানেক পেলেয়ার এই ক্লাবে খেলে গেছে।...'

সে সময় মানিকদাকে দেখলে যে কেউ বলতে পারত, তার টেনশন যে কোন খেলোয়াড়ের চেয়ে দশগুণ বেশি।

একদিন ফোঁটা দেবার সময় বলল, 'বুঝে শুনে খেলো বাছা, আজ খেলা ১—১। বেশী ক্যাদ্দানি দেখাতে গেলে চামড়া ছাড়িয়ে নেব।'

কলকাতার মাঠে নবাগত জয়ন্তর গট আপ ম্যাচ সম্বন্ধে ধারণা থাকলেও,তাকেও যে কখনো তেমন খেলা খেলতে হবে, সেটা ভাবেনি। ও শিশুর মত বলেছিল, 'মানিকদা, তবে গট আপ— !'

গট—আ—প !' মানিকদা ভেংচে উঠল। 'কাগজের কথা মুখস্থ করা

হয়েছে ? ক্লাব চালাবার পয়সা তোমার কাগজওয়ালারা দেবে? কুল্লে তো সাড়ে সাতান্ন জন মেম্বার। তাদের চাঁদার পয়সায় বড়জোর একটা হরি সঙ্কীর্তনের দল চলতে পারে, ফার্স্ট ডিভিসনেব ফুটবল কেলাব করা যায় না। একটা পয়েণ্টের বিনিময়ে কিছু টাকা আসবে ক্লাবের ঘরে, মনে রেখো আজ তোমরা খেলতে যাচ্ছো না, ক্লাবকে বাঁচাতে, কলকাতার ফুটবলকে বাঁচাতে, আমার হাত থেকে নিজেদের পিঠের চামড়া বাঁচাতে মাঠে নামছ।…

মানিকদা এককালে সরকারের ওয়েট এ্যাণ্ড মেজারমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট চাকরি করতেন, তার কাজটা ছিল বাটখারার ওজন টোজন নিয়ে, তাই মাঠে ওর একটা গোপন নামও তৈরি হয়ে গিয়েছিল—'বাটখারা'। তা সেই 'বাটখারা' প্রায়ই খেলা নিয়ে দারুণ দারুণ জ্ঞান দিতেন। বলটা এভাবে ধর—ওভাবে মার, ওই পাটকাঠির মত মুড়মুড়ে এ্যাঙ্কল দিয়ে ফ্লিক করাতে গেলি, ইত্যাদি ইত্যাদি…। কিন্তু মানিকদা নিজে কতদূর কী জানেন বা বয়সকালে কতটা পারতেন, সে বিষয়ে প্রত্যেকেরই যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

মানিকদার কথায় জয়ন্ত একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। যোগো হামলে পড়ল, 'আরে শোনই না পুরো ঘটনাটা। বাড়ির সামনে পার্কে খেলা হচ্ছে। ছেলেগুলো মানিকদাকে রোজ দেখে না, হঠাৎ এসে উপদেশ দিতে, ওরা বেজায় খাপ্পা হয়ে তেড়ে উঠেছে। নিজে করে দেখান তো ? মানিকদা বয়সের দোহাই দিয়ে ছাড়া পেতে চেয়েছিল ; ছেলেরা ছাড়বে কেন ? শেষ পর্যন্ত নিজের সম্মান রক্ষার জন্যই বলে পা দিলেন। একজন ফুল ব্যাক ভলি করে শুধু ক্লিয়ার করবে না, নিজের ফরোয়ার্ডকে বল জুগিয়ে কি করে আক্রমণের সূচনা করতে পারে, এটাই বোঝাবার ইচ্ছে ছিল মানিকদার। দীর্ঘ সময় ধরে মুখে জ্ঞান দেবার পর, একটা ছেলে তেড়িয়া হয়ে বলল, 'থিওরিটিক্যাল নলেজ আমাদের আছে, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করব।' মানিকদার বুকের মধ্যে তখন সুপ্ত সিংহ আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠেছে। ফুট দুয়েক উঁচু করে বাড়িয়ে দেওয়া একটা বলকে ভলি করতে যেতেই প্রথমে ডান

কুঁচকিতে টান লাগল, তারপর মুখ থুবড়ে পড়লেন, বেকায়দায় পড়ে ডান পা-টা মটাৎ।'

হাসিঠাট্টার মধ্যে বেশ ভালোই কাটল দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যেটা। যোগোর সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল, ও দোকানে গেল, জয়ন্ত এসে খোলা ছাদে দাঁড়াল। বাতাসে একটা ক্ষীণ শিরশিরে ভাব। শীতের অনেক দেরী, তবু বুঝি শীতবুড়োর দু' একজন সৈনিক এর মধ্যেই খুব গোপনে চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাচ্ছে। জয়ন্ত চারদিকে তাকাল আকাশের। রাঁচীটা ঠিক কোন্ দিকটায় হবে ? রুমা কি এখন তার মতো তারা দেখছে আকাশের ? রুমার পাশাপাশি আর একটা মুখের ছবি মনে ভেসে উঠতেই ভারী লজ্জা পেল জয়ন্ত—পাখি এভাবে মাঝে মাঝেই তার মনের মধ্যে এসে যাচ্ছে। জয়ন্ত ঠিক করল আজ রাতে সে মা আর রুমাকে রাঁচীতে চিঠি লিখবে। আর একটা চিঠি লিখবে ছোট্টুদার সেজদিকে। সেজদি চিঠি পাওয়ার পর কি বাড়িতে আর সকলকে সেকথা বলবে ? বলবে কী জয়ন্ত কলকাতায় নিরাপদ আশ্রয়ে আছে ?

একটা রাতচরা পাখি জয়ন্তর মাথার ওপর দিয়ে ডেকে চলে গেল, জয়ন্ত তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাও পাখি বলো তারে, সে যেন ভোলে না মোরে।'

*

যোগোরা একটা ছোট্ট বাড়ি নিয়ে থাকে, বাড়িতে ওরা ছাড়া আর ভাড়াটে কেউ নেই। যোগোদের লোকজনও কম, তিন অবিবাহিত কাকা, যোগোর বুড়ো বাবা মা আর কাজের জন্য একটা ছোকরা—ফলে এ বাড়িতে থাকতে জয়ন্তর অসুবিধের কোনই কারণ নেই। বাড়তি সুবিধে হল বাড়ির প্রত্যেকটি লোক নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, অন্যের ব্যাপারে অহেতুক নাক গলাবার চেষ্টা নেই।

পরদিন সন্ধ্যাবেলাতেও তারাভরা আকাশের তলায় ছাদের কার্নিশে দাঁড়িয়েছিল জয়ন্ত। যোগো গেছে মোড়ের মাথা থেকে গরম জিলিপি আনতে—দোকানটায় সকাল সন্ধ্যা সারাক্ষণ জিলিপি ভাজা হচ্ছে।

জয়ন্ত মাকে চিঠি দিয়েছে। ছোট্টুদার সেজদি আর তিন্নিকে দুটো আলাদা আলাদা চিঠি দিয়েছে। বাড়িতে ফোন করে বাবার সঙ্গে কথা বলেছে। বাবাকে বড় বেশি গম্ভীর মনে হল। জয়ন্ত বলতে যাচ্ছিল সে এখন কোথায় আছে। বাবা বারণ করলেন,—'আমাকে তোমার হোয়্যার অ্যাবাউটস জানিওনা, আমি দুর্বল প্রকৃতির মানুষ, চাপের মুখে হয়ত বলেও ফেলতে পারি।'

—'খুব কি গোলমাল হচ্ছে?'

—'না, তেমন কিছু না। তবে চাপ একটা আছে—।'

—'চাপ মানে?'

—'ভয়ের চাপ। যে ছেলেগুলো হল্লা করেছিল, তারাই তো রকে বসে থাকে। কিছু বলে না, শুধু আড়চোখে তাকায়। খালি লক্ষ্য করে। একদিন ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম রিক্সায় চেপে—দুটো মোটর সাইকেলে চারটে ছেলে যাতায়াতের পুরোটা পথ আমার সঙ্গে সঙ্গে রইল।'

জয়ন্ত একটা বড় শ্বাস ফেলে ফোনটা নামিয়ে রাখে।

জিলিপির ঠোঙা নিয়ে চিন্তিত মুখে ফিরল যোগো।—'জয়ন্ত আমি একটা কথা ভাবছি, তোকে বাদ দিয়ে টিম কী করে হবে? ডুরাণ্ডে যাওয়ার আগে প্র্যাকটিস শুরু হবে যখন, তখন টের পাওয়া যাবে।'

—'ক্লাব তবে ডুরাণ্ডে যাচ্ছে। ·· আমার সাবস্টিটিউট ঠিকই আছে, সিদ্দিক খেলবে।'

—'হ্যাঁ সিদ্দিক খেলবে···' ভেঙ্গচে উঠলো যোগো। এর চেয়ে বরং ক্লাবের একজন মালীকে নামিয়ে দেওয়া যায়। তোকে লাগবেই। তারপর ষড়যন্ত্র করার ভঙ্গিতে বলল, 'চল না আজ রাত্তিরেই টুক্ করে পি. সি'র বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। নক্ করে দেখা যাক্ না একবার, দেখি না কী বলে।'

'একেবারে বাড়ি যাবি, একটা ফোন করলে হত না?'

যোগো খানিকক্ষণ ভেবে বলল, 'ঠিক আছে ফোনই করা যাবে। তবে তুই বলিস্ না আমার এখানে আছিস। আগে হাওয়াটা বোঝার চেষ্টা কর।'

—'বিভূতিদার কাছে গেলে হত না?'

—'ফুঃ! বিভূতিদা লোক খুব ভালো, তোকে ভালোবাসে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ওখানে কিস্সু হবে না। রোগটা হয়েছে সার্জারী করার, আর তুমি তাকে ঝাড় ফুঁকে সারাবে, তাতো হবে না।'

রসভর্তি জিলিপিতে কামড় দিতে দিতে জয়ন্ত অন্যমনস্ক হয়ে গেল। খেলোয়াড় জীবনে ফিরে আসার জন্য ক্লাবের অনুগ্রহটা একান্ত দরকার। সুযোগ পেয়ে যদি ভালো খেলতে পারে, তবে দর্শকদের মনের ক্ষোভটায় আস্তে আস্তে সান্ত্বনার প্রলেপ পড়বে। তবে যারা পাবলিক মেমারিকে ক্ষণস্থায়ী বলে, তারা ঠিক কথা বলে না। অন্তত ফুটবলের দর্শকরা কোন খারাপ ঘটনাকে চট্ করে ভোলে না। জয়ন্ত ভাবতে গিয়ে হতাশ হল, ও কোন ভাল সম্ভাবনাকেই গ্রহণ করতে পারছে না। জনতার রোষের চেয়েও আর একটা ভয় এখন ওর শির-দাঁড়ার ভেতরে শীতল স্রোত প্রবাহিত করে—ওর খেলোয়াড় জীবন কি তবে এখানেই শেষ? এত বছরের পরিশ্রম, অধ্যবসায় তার জীবনে আর কি কোন ফল দেবে না?

যোগো বলল, 'ফোনটা তাহলে খাওয়া দওয়ার পর দশটা নাগাদ করিস্। পি. সি তখন বাড়ি থাকে।'

জয়ন্ত ভয় পাওয়া জন্তুর মত তাকাল যোগের দিকে। কলকাতায় যখন রওনা দিয়েছিল, যে কারণেই হোক মুখোমুখি দাঁড়াবার, লড়াই করার সাহসটা ওর ছিল। এখন ও ভয় পাচ্ছে, ক্লাব কর্তৃপক্ষ যদি সরাসরি নাকচ করে দেয়, তবে আর কোন রাস্তা থাকবে না। আগামী বছর ট্র্যান্সফারের সময় সে বড়জোর একটা ছোট কিম্বা মাঝারি দলে যেতে পারবে। কিন্তু সেটা তো হবে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নিচে নামার সূচনা। দু'চার বছর এ ও ক্লাবে টিঁকে থাকার পর টুপ্ করে একদিন ময়দান থেকে খসে পড়বে। কেউ জানতেও পারবে না।

রাতের খাওয়ার পর জয়ন্ত যোগোর কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে নিল। ওরা দু'জন বসবার ঘরে—সোফার ওপর, যোগো গা এলিয়ে আর জয়ন্ত পিঠ টান করে সোজা হয়ে বসে আছে। জয়ন্তর হাতটা

মৃদু কাঁপছে, সিগারেটটা লক্ষ্য করলে কাঁপুনিটা বোঝা যায়। জয়ন্ত ঘরের কোণায় ছোট্ট টেবলটার ওপর রাখা টেলিফোনের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে বারবার। ভাবখানা ওখান থেকেই যে কোন মুহূর্তে চকিত আক্রমণ শুরু হতে পারে।

একসময় জয়ন্ত উঠে টেলিফোনের কাছে গেল। যোগো পেছন থেকে বলল, 'তুই দাঁড়া, আমি ডায়াল করছি।' যোগোর মুখটা গম্ভীর। সিগারেটটা হাতে ধরাই আছে, টানা আর হচ্ছে না, ছাইটা লম্বা হয়ে আছে। যোগো অন্যমনস্কভাবে সবশুদ্ধ অ্যাসট্রেতে ফেলে টেলিফোনের কাছে উঠে এল। ক্রেডল থেকে রিসিভারটা তুলে নিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'ফোর সিক্স থ্রি নাইন '

ওদিক থেকে রিং হতেই ফোনটা জয়ন্তর হাতে গুঁজে দিল। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে রইল।

জয়ন্তর বুক কাঁপছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, ঘাম জমছে কপালে। 'হ্যালো!' পি. সি'র গলা।

জয়ন্ত কাঁপা কাঁপা গলায় কোনক্রমে বলল, 'আমি···আমি জয়ন্ত···

—'তা কী ব্যাপার? যোগোর বাড়ি থেকে ফোন করছো...?'

—'না তো' জয়ন্ত থতমত খেয়ে ফোনটাই প্রায় ছেড়ে দিচ্ছিল।

—'তুমি গতকাল তোমার অফিসে এসেছিলে,সেখান থেকে তোমরা ট্যাক্সি করে যোগোর বাড়ি এসেছো—যোগো আগে থাকতে ট্যাক্সি নিয়ে জি. পি.-ও'র সামনে ওয়েট করছিল!' পি. সি'র ওঠানামাহীন আবেগশূন্য গলা, তবু বোঝা যায় তার মধ্যে একটা চাপা হাসির বা ব্যঙ্গের ভাব আছে।

জয়ন্ত বোবা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফোনের ওপার থেকে পি. সি ও সেই কথাই বলল, 'কি ব্যাপার বোবা হয়ে গেলে নাকি?' এবার একটু অস্পষ্ট হাসির আওয়াজ। 'তোমাকে যে সব মারধোর করেছিল সেসব ব্যথাট্যথা সেরেছে?'

—'এ্যাঁ, হ্যাঁ! আমি এখন পুরো ফিট, কালকেই দরকার হলে মাঠে নামতে পারি।'

—'পায়ের অবস্থা কেমন? ছোট্টু বলছিল তোমার নাকি হাঁটুতে চোট লেগেছে।'

—'ব্যথা হয়েছিল অনেক জায়গায়। এখন সব সেরে গেছে।'

—'সেরে গেলেই ভাল। ভাল ভাবে থেকো—।'

এসব কথা থেকে জয়ন্তর দুশ্চিন্তা লাঘব হল না বিন্দুমাত্র। ও আকুলভাবে বলল, 'আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

—'এসো একদিন…কখন দেখা পাবো? এমনিতে আমি তো খুব ব্যস্ত থাকি।' বলেই ওদিক থেকে খট্ করে ফোনটা নামিয়ে রাখার আওয়াজ এল।

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে জয়ন্ত ভ্যাবলার মত যোগোর দিকে তাকাল।

যোগো তাই দেখে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল, 'ধিনিকেষ্টর মত দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন? যা চিলেকোঠায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়।'

জয়ন্তও বেশ রেগে উঠে বলল, 'আমি কী করবো? আমার কী দোষ?'

—'পি. সি তোকে কী বলেছে আমি আন্দাজ করতে পারছি। তোর কেসটা এমন বাজে যে, তাই নিয়ে এ্যাডভোকেসি করতে গেলে লোকে ভাববে, তোর ঘুষের টাকায় আমারও কিছু বখরা আছে।'

—'যোগো!' জয়ন্তর চিৎকারটা কেমন ফ্যাশফেশে লাগল। এই দ্বিতীয়বার যোগো তাকে একই জায়গায় ঘা দিল। জয়ন্তর বুকের ভেতরটা কনকন করছে, কান টান গরম হয়ে উঠেছে। ওর ইচ্ছে যোগোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা নির্মম আঘাত করতে ইচ্ছে করছে। জয়ন্ত সোফার ওপর শরীরটাকে দুমড়ে মুচড়ে বসিয়ে মনে মনে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছে।

যোগো উঠে গিয়ে ড্রয়ার টেনে একটা বিলিতি সিগারেটের প্যাকেট বের করে জয়ন্তর দিকে একটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'খা বিলিতি সিগারেট খা…নবাব পুত্তুর আমার।'

জয়ন্তর পায়ের কাছে সিগারেটটা এসে পড়ল। ও খুব অবাক হয়ে

ভাবল, যোগো তাকে অপমান করার চেষ্টা করছে কেন, ওকে চটিয়ে দিয়ে যোগোর কী লাভ! ওতো যোগোকে বন্ধু বলেই জানে।

যোগো ওর বিরাট শরীরটা নিয়ে দুপ্ দাপ্ করতে করতে ঘর ছেড়ে চলে গেল। জয়ন্ত একলা অনেকক্ষণ বসে রইল ঝিম্ মেরে। তারপর উঠতে গিয়ে মাটিতে পড়া সিগারেটর দিকে চোখ পড়ল। ও পরম আগ্রহভরে সেটাকে দু'আঙ্গুলে তুলে নিয়ে নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করল।

একটু আগে দুঃখ আর বিস্ময়বোধে ওর মনটা যেভাবে ছেয়েছিল, সেটা এখন থিতিয়ে পড়েছে ও খানিকটা চিন্তাশূন্য মনেই ড্রয়ার থেকে দেশলাই বের করে সিগারেটটা ধরাল।

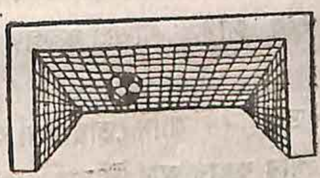
বসার ঘরের আলো পাখা নিভিয়ে দরজা জানলা বন্ধ করে পা টিপে টিপে ছাদের ঘরে চলে এল। দরজাটা খোলা, কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি হয়েছে, ভেজা বাতাস বইছে জোরে। ঘরে ঢুকে দেখল অন্ধকারে বালিশটাকে দু'হাতে আঁকড়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে যোগো। আলো জ্বাললো না জয়ন্ত, মনে হল যোগো কাঁদছে।

সে রাতে জয়ন্ত আবার একটা স্বপ্ন দেখল। একটা বিরাট কাচের দেওয়াল দেওয়া ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা টেবিল। আর টেবিলের ওপর জয়ন্তর মৃতদেহ শায়িত। যোগো আর পাখি যত্ন করে তার দেহটা বড় বড় শ্বেতপদ্ম দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে। একটু দূরে সার বেঁধে সাদা পোশাক পরা আটটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। জয়ন্তর মনে হল ওরা তার মৃতদেহটা বহন করে নিয়ে যাবে। কাচের দেওয়ালের বাইরে অসংখ্য মানুষ। তাদের চেহারা দেখলেই জয়ন্ত নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারে ওরা সব ফুটবল মাঠের দর্শক। একদম সামনের সারিতে পি. সি. ঘোষ, বিভূতিদা, ছোটুদা। ওরা ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। কিন্তু সবুজ পোযাক পরা দ্বাররক্ষী শক্ত হাতে দরজা আগলাচ্ছে এমন সময় একটা সাদা গাড়ি চেপে বলরাম, জার্নাইল সিং, চুনী গোস্বামী, মেওয়ালাল আরো কয়েকজন এসে দরজার কাছে দাঁড়াতেই দ্বাররক্ষী দরজা খুলে তাদের অভিবাদন করল। ওরা ভেতরে ঢুকে জয়ন্তর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে একটুক্ষণ দেখলেন। তারপর নিচু গলায়

নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করতে করতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। এরপর পাখি এসে একটা ফুটবল যত্ন করে ওর বুকের ওপর রাখল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর মৃতদেহটা নড়ে চড়ে উঠল, বাইরে জনতার কাছ থেকে একসঙ্গে হৈ হৈ রব শোনা গেল। জয়ন্ত ভয় পেয়ে এত বেশি চমকে উঠল যে, তার ঘুমটাই ভেঙে গেল।

দরজা দিয়ে হু হু করে বাতাস ঢুকছে। জয়ন্ত খানিকক্ষণ শুয়ে শুয়ে বুকের তোলপাড় করা আওয়াজ শুনল। জানলা বা দরজা দুটো দিয়েই আকাশ দেখা যাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। ও সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবল এই মোহময়ী নীল জ্যোৎস্নার মধ্যে যদি সে একটা বল নিয়ে যেতে পারত ময়দানে? ছোটবেলায় যেভাবে প্র্যাকটিস করত, এখনো সেভাবে আবার সব কিছু শুরু করলে মন্দ হয় না। নিজের প্রায় অজান্তেই একসময় সে স্টার প্লেয়ার হয়ে গিয়েছে। খেলার কায়দাকানুন কৌশল এখন নিশ্চয় তার অনেকটা আয়ত্বে, তবু নানা খাঁজে ফাঁকি বা অপটুত্বের গ্লানি জমে গেছে। জয়ন্ত ভাবল; সুযোগ পেলে সে আবার উঠে পড়ে লাগবে নিজেকে তৈরি করে নিতে।

যোগো নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। রাস্তা দিয়ে একটা মাল বোঝাই লরী চাপা গম্ভীর আওয়াজ করে চলে গেল। জয়ন্তর বিছানায় পড়ে থাকাটা অর্থহীন মনে হল, বাইরে ছাদে এসে কার্নিশের ধারে দাঁড়িয়ে আপন মনে ছেলেবেলায় শেখা একটা গান গুণগুণ করতে লাগল।



ঘুম ভেঙে জয়ন্ত দেখল সারা ঘর রোদ্দুরে ভেসে যাচ্ছে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দুর্গাপূজার প্যাণ্ডেলের বাঁশের কাঠামো বানানোর কাজ চলছে। জয়ন্ত বালিশের তলা থেকে হাতঘড়ি বের করে দেখল সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। সে তক্ষুণি বিছানা ছেড়ে না উঠে প্যাণ্ডেল বাঁধার

কাজ দেখতে লাগল। তারপর একসময় হাই তুলে বিছানা থেকে নেমে এল।

নিচে বসার ঘরে যোগোর সঙ্গে দেখা। এর মধ্যেই ও জামাকাপড় বদলে ফিটফাট হয়ে নিয়েছে। যোগো টেলিফোনে কার সঙ্গে কথা বলছিল। টেলিফোনের এক দিকের কথা শুনে জয়ন্ত কোন কিছুই আঁচ করতে পারল না।

কথা শেষ করে যোগো জয়ন্তর দিকে চিন্তিত মুখে তাকাল। তুই হাত মুখ ধুয়ে জল খাবার খা, কাগজ টাগজ পড়, এ সপ্তাহের 'খেলার আসর' আর 'স্পোর্টস উইক' আছে—এসব পড়তে পড়তেই আমি এসে পড়ব।'

—'তুই কি তোর স্কুটারে যাবি?' জয়ন্ত জানতে চাইল।

—'না, মিনি বাসে চলে যাব, কেন বলতো?'

—'চাবিটা রেখে যা, আমি বেরোবো।'

বাচ্চা ছেলের অসম্ভব আব্দার নস্যাৎ করে দেবার আগে যেমন তার অজ্ঞতায় বড় মানুষরা হাসে, জয়ন্তর কথায় ঠিক সেভাবে হাসল যোগো তারপর সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'তোর একটা হিল্লে করার জন্যই যাচ্ছি। আজ সকালে উঠেই বিভূতিদাকে ফোনে কনট্যাক্ট করেছিলাম। বিভূতিদা তোর কথা শুনে বোধহয় পি. সি-কে ফোন করেছিল। এই একটু আগে পি. সি আমাকে ফোন করে বলল খিদিরপুরে ভবেনদার বাড়িতে যেতে। সেখানে আরো তিন চারজন থাকবে।'

—'সেখানে তো তবে আমার যাওয়া দরকার। তুই দাঁড়া, আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

—'না, এরা তোকে ডাকেনি। আমি তোর কথা বলেছিলাম।'

জয়ন্ত এরপর যোগোর কথায় আর উৎসাহ দেখাল না। শুধু বলল স্কুটারের চাবিটা রেখে যাবি না তাহলে?'

—'আজ রোববার, প্রতিটি মোড়ে উঠতি ছেলেদের জটলা। তুই স্কুটারে চড়ে ঘুরে বেড়াবি—ব্যাপারটা ঠিক নয়।'

জয়ন্তর খুব ইচ্ছে করছিল, শরতের এই নীলে সোনায় মেশা

সকালটায় ও খানিকক্ষণ স্কুটারে চড়ে ঘুরে বেড়াবে, সেটা হল না। জয়ন্তর ধারণা শিল্ড ফাইনাল নিয়ে লোকদের আর তেমন মাথাব্যথা নেই। কলকাতার যুবকদের কাছে প্রত্যেকটি দিনই এমন ঘটনাবহুল যে, পুরনো একটা বিষয় নিয়ে তারা উত্তেজিত হবার সময় পাবে না। শিল্ডে হেরে যাওয়া নিয়ে তার দলের সাপোর্টারদের মনের মধ্যে একটা দুঃখবোধ চাপা পড়ে আছে, সেটা সহজে যাবে না কিন্তু তাকে দেখলেই সবাই রে রে করে তেড়ে আসবে, সেটা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। টিটকিরি শুনতে হতে পারে, দু'একটা ছোটোখাটো ঢিলও ছুঁড়তে পারে কেউ, কিন্তু তার বেশি আর কিছু হবে না। এসব যুক্তি মনের মধ্যে খাড়া করতে করতে জয়ন্ত নিজেই বুঝতে পারছিল, সে যতটা সহজ করে ব্যাপারটা ভাবতে চাইছে প্রকৃতপক্ষে তা নয়। চিন্তার মধ্যে ইচ্ছাপূরণ হল না বলে জয়ন্ত মনে মনে ক্ষেপে রইল।

চা দিয়ে গিয়েছিল। সেটা পড়ে থেকে থেকে ঠাণ্ডা হল। জয়ন্ত স্টেটসম্যান খুলে খুব মন দিয়ে পার্সোনাল কলামটা পড়তে লাগল।

এ বাড়িতে এসে জয়ন্ত কারো সঙ্গে ভাব করেনি। বেশির ভাগ সময়ই চিলেকোঠার ঘরে বসে থাকে, বাড়ির লোকজনের সঙ্গে দেখা হবার বিশেষ সুযোগ নেই। খেতে ডাকলে খুব অন্যমনস্কভাবে গপ্ সপ্ করে খেয়ে উঠে চলে যায়। তবু এর মধ্যেই দেখে টেখে চিনে গেছে যোগোর বাবা কাকাদের, মা-কে চেনাটা কঠিন নয়।

যোগোর মেজকাকাই হবে, শুকনো পাকানো চেহারা, মুখের মধ্যে সবসময় একটা ধরা পড়া অপরাধীর ভাব, জয়ন্তর কানের কাছে মুখ এনে খুব কাঁচুমাচু ভাবে বলল, 'আপনি তো স্টেটসম্যানের ভেতরের পাতা পড়ছেন, ফার্স্ট পেজটা আমাকে দেবেন?'

জয়ন্তর মনটায় এমনিতেই খিঁচ ধরেছিল তার ওপর কানের কাছে মুখ এনে ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলায় ও হঠাৎ বেশ জোরে ধমকে উঠল, 'না, দেব না, আমার পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।' এ বাড়িতে এভাবে কথা বলাটা জয়ন্তর পক্ষে অনুচিত, তার ওপর এটা একরকম অভদ্রতাও কিন্তু তারজন্য জয়ন্তর মনে কোন বিকার ঘটল না।

জয়ন্ত একটু বাদে সাজগোজ করে রাস্তায় বেরোল! যোগো এখন নিয়মিত সিগারেট অফার করছে তার ওপর মানসিক উৎকণ্ঠার জন্য সিগারেট খাওয়াটা একটু একটু অভ্যাস হয়ে গেছে তার। পাড়ার মোড়টা ছাড়িয়ে পরের মোড়টায় এল জয়ন্ত। তার দলের ফ্লাগ উড়ছে একটা গলির মুখে। শিল্ড ফাইনালের দিন নিশ্চয় টাঙানো হয়েছিল, খুলে নেওয়া হয়নি।

রাস্তায় যথেষ্ট লোকজন রয়েছে, সকলের চোখে ধুলো দিয়ে যে সে যাচ্ছে তা নয়। জয়ন্তর মনে হল কেউ হয়ত তেমনভাবে খেয়াল করছে না বা খেয়াল করলেও কোন পাত্তা দিচ্ছে না।

জয়ন্ত দোকান থেকে সিগারেট কিনে, দেবদারু গাছের সঙ্গে লটকানো দড়ির আগুনে ঝুঁকে পড়ে সেটা ধরাচ্ছিল, এমন সময় পিঠে আলতো করে একটা হাতের ছোঁয়া পেল। জয়ন্ত চকিতে মুখটা ঘুরিয়ে দেখে অচেনা মানুষ। বেশ গোলগাল, চশমা চোখে, সজ্জন চেহারার হাস্যময় এক যুবক!

—'জয়ন্ত মিত্র না?'

হঠাৎ আক্রমণের আভাস পেলে টেক্সাস ফিল্মের নায়করা যেভাবে কোমরে হাত দেয় রিভলভারের জন্য, সেভাবে জয়ন্ত হাতটা চালাল। কিন্তু হায়! কোমরটাও শূন্য। ও থতমত খেয়ে বলল, 'ই—য়েস! হ্যাঁ —তো আপনি—।'

ছেলেটির মুখে হাসিটি এখনো একই রকমভাবে লেগে আছে যেটা দেখলে বন্ধুত্ব করার ইচ্ছেটা জাগে।

—'আমার নাম বিকাশ নন্দী। বিখ্যাত কেউ নই। ...আপনাকে মনে মনে অনেক দিন ধরে খুঁজছি ভাবিনি এভাবে দেখা পেয়ে যাব ছেলেটি খুব পেলব ভঙ্গিতে কথা কটা বলে আবার হাসল। জয়ন্তর হাত আর একবার কোমরে ব্যর্থ অনুসন্ধান করে ফিরে এল। বিকাশ বললেন, 'আপনার তাড়া না থাকলে আসুন না একটু আড্ডা মারি। রাস্তার উল্টোদিকের হলুদ বাড়িটা আমাদের।

জয়ন্ত সেদিকে তাকিয়ে নিল একবার, তারপর কী জানি কি ভেবে

বলল, 'চলুন ! —আচ্ছা আমাকে কেউ মারবে নাতো ?'

বিকাশ অবাক হয়ে একবার তাকিয়ে পর মুহূর্তেই আশঙ্কার কারণটা বুঝে নিয়ে জয়ন্তর পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে আশ্বস্ত করল।

জয়ন্ত আর বিকাশ একটা সুসজ্জিত পারলারে বসে দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত নানা গল্পে মত্ত হয়ে রইল। এদিকে খিদিরপুরে ভবেনদার বাড়িতে তখন অন্য একটা নাটক চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছতে যাচ্ছে, যার নেপথ্যবাসী কেন্দ্রীয় চরিত্র জয়ন্ত মিত্র।

যোগো যখন গিয়ে পৌঁছল, তার আগেই পি. সি ঘোষ, বিভূতিদা, ছোট্টুদা পৌঁছে গেছে। ভবেনদার নিজের বাড়ি—তিনি ত থাকবেনই! ওরা নরম গদী আঁটা সোফাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিল। ভবেনদা সেন্টার-টেবলটার ওপর ঝুঁকে পড়ে দাবার ঘুঁটি নেড়েচেড়ে কি বোঝাচ্ছিলেন! দাবার বোর্ড নেই, খালি টেবলের ওপর ঘুঁটি নাড়ছিলেন, যোগো অবাক হয়ে সেদিকে তাকাল।

যোগো ঘরে ঢোকাতে ভবেনদার কথায় একটু ছেদ পড়ল। সকলে মুখ তুলে তাকাল। বিভূতিদা শুধু হাসল অল্প করে। ছোট্টুদা বসা অবস্থাতেই কাৎ হয়ে প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা দোমড়ানো খাম বার করে যোগোর দিকে এগিয়ে দিল, 'জয়ন্তর চিঠি। সেজদির বাড়িতে এসেছিল, ওরা আমার ঠিকানায় রি-ডাইরেক্ট করে পাঠিয়ে দিয়েছে।' যোগো যত্ন করে চিঠিটা পকেটে রাখল।

ছোট করে গলা খাঁকারি দিয়ে ভবেনদা আবার তার কথা শুরু করলেন। যোগো কান খাড়া করে শুনে বুঝল, দাবার ঘুঁটিগুলো দিয়ে একেকজন খেলোয়াড়ের পজিশন বোঝানো হচ্ছে। যোগো এক ঝলক তাকিয়েই এবার বুঝতে পারল গোলের কাছাকাছি কালো ঘোড়াটা জয়ন্তর অবস্থান বোঝাচ্ছে। ও ব্যাপারটা দেখে একটু বুদ্ধিমানের মত হাসল।

ভবেনদা একটু চেঁচিয়ে কথা বলেন, বুদ্ধিটা প্রখর নয়, সে ঘাটতিটুকু মুরুব্বীয়ানা আর ভারিক্কী চাল দিয়ে ঢেকে রাখেন। ভবেনদা আদালতের উকিলদের মত বললেন, 'আমি ফর্টি ইয়ার্স এই ময়দানী ফুটবল

নিয়ে নাড়াচড়া করছি, আশাকরি আপনারা স্বীকার করবেন, ফুটবল খেলাটা স্ট্যানলি রাউসের মত না বুঝলেও আমি কিছুটা বুঝি। জয়ন্তর সেদিন সে মুহূর্তে পজিশন ছিল এইখানে, বল আসছিলো এইভাবে কোণাকুণি। তো আমাকে আপনারা বুঝিয়ে বলুন, জয়ন্তর মনে সত্যিই যদি কোন দুরভিসন্ধি না থাকত, তবে এ বল কিভাবে গোলে ঢোকে ওদের রাইট আউট এগিয়ে এসেছিল ঠিকই কিন্তু বল তো তখন পুরো-পুরি জয়ন্তর কণ্ট্রোলে। ইটস আ ক্লিন সাবোটাজ।

পি. সি ঘোষ খুব বিজ্ঞের মত মাথা নাড়লেন। তারপর কিছু একটা বলার জন্য গলা খাঁকারি দিয়ে সকলের দিকে একবার চাইলেন। যোগোর দিকে দৃষ্টিটা খানিকক্ষণ স্থির হয়ে রইল। তারপর খানিকটা অন্যমনস্কের মত শুরু করলেন, 'শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে জয়ন্তর মত একজন খেলোয়াড়কে কোন শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। যে গোলের জন্য জয়ন্তকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে, সেটি আমি ব্যক্তিগতভাবে বারবার বিশ্লেষণ করে দেখেছি, আমার বিশ্লেষণের ফল জয়ন্তর পক্ষে গেলে আমি খুশী হতাম, কিন্তু সে ভাগ্য আমার নেই। এছাড়া ছোট্টু বলেছে, শতদল ভদ্রের সঙ্গে জয়ন্ত কথা বলেছে, এ সাক্ষী সে নিজে। ছোট্টুকে দেখে তারা কথা থামিয়ে দেয়—কিন্তু তার আগেই ছোট্টু যা শোনার শুনে ফেলেছে, ওকে শতে,যাকে অনেকে এখন শতদলদা বা বাবু বলে ডাকে, গ্র্যাণ্ড হোটেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। বুদ্ধিমান জয়ন্ত সে কাজ করেনি, সে আমাদের ক্লাবের আশ্রয়ে ছিল, কিন্তু বোঝাপড়াটা আগেই হয়ে গিয়েছিল।'

ভবেনদা বললেন, 'শতদল ভদ্র জয়ন্তর বাড়িতে মাঝে মাঝে যেত, এমন কথা সকলেই জানে।'

পি. সি. ঘোষ তার দিকে তাকিয়ে বক্তব্যটা স্বীকার করে নেওয়ার ভঙ্গিতে ঘাড় নড়লেন। 'এছাড়া আমি গোপন সূত্র থেকে জানতে পেরেছি, জয়ন্তকে বলা হয়, যদি সে সত্যি এ ধরনের একটা অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারে তবে তাকে নগদ পাঁচ হাজার আর একটা টিভি সেট কিনে দেওয়া হবে।'

কাছেই বোধহয় কোন পাঁক জমা নর্দমা আছে, তার গন্ধে যোগোর শরীর ঘুলিয়ে উঠল। ও জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একদলা থুতু ফেলল তারপর বলল, এতবড় অভিযোগ যখন করছেন, তখন গোপন সূত্রটা আপনার জানানো উচিত, সেটা তাহলে আমরা সবাই যাচাই করে নিতে পারি। নাহলে আপনার কথাটা বিশ্বাস করা উচিত হবে না। আর আজকে এখানে জয়ন্তকে আপনাদের ডাকা উচিত ছিল। এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আপনারা জয়ন্তর সঙ্গে কেউই কোন কথা বলেননি।'

ফ্যানের হাওয়ায় সিগারেট ধরাতে অসুবিধে হচ্ছিল বিভূতিদার। গোটা চারেক কাঠি নষ্ট করার পর সিগারেট ধরিয়ে লম্বা একটা টান দিয়ে বললেন, 'যদি আমরা ধরেই নিই, জয়ন্ত দোষ করেছে, জয়ন্তর স্বার্থে নয়, ক্লাবের স্বার্থেই ওকে দলে রাখা উচিত। ক'দিন বাদে টিম ডুরাণ্ড খেলতে যাবে, কে খেলবে লেফ্‌ট ব্যাকে?'

পি. সি. ঘোষ নির্বিকার ভাবে জবাব দিলেন, 'কেন গণেশ খেলবে!'

কথাটায় সবাই চমকে উঠল, বিভূতিদা বলল, 'গণেশ! ওতো প্র্যাকটিক্যালি গত বছর থেকেই রিটায়ার করেছে। তবু ওবছর দুটো ম্যাচে খানিকক্ষণ করে খেলেছিল, এবার তো একদিনও ড্রেস করেনি। নেহাত ক্লাব ছেড়ে যায়নি বলে রয়ে গেছে।'

—'গণেশের এককালে ফর্ম ছিল। মনে রেখো ওল্ড ইজ গোল্ড।'

বিভূতিদা বিরক্ত হয়ে বলল, 'খুবই অর্থহীন কথা।'

যোগো বুঝল বিশ্রী একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। গণেশদার মত খেলোয়াড়ের এখন যা অবস্থা, তাতে তাকে মাঠে নামানোর চেয়ে দশজন প্লেয়ার নিয়ে মাঠে নামটা ভালো। আসলে জয়ন্তকে রিপ্লেস করার মত প্লেয়ার তাদের দলে-কেন, কলকাতার মাঠে কেউ নেই। যোগো বলল, 'আমাকে আপনারা ডেকেছেন কেন এখানে?'

ভবেনদা বলল, 'তুমি জয়ন্তর বুজুম ফ্রেণ্ড। তোমার কাছ থেকে শুনলে ও বিশ্বাস করবে, ওকে নিয়ে আমরা কি আলোচনা করছি।'

যোগো তেড়িয়া হয়ে বলল, 'গুলি মারুন আলোচনা টালোচনায়। মোদ্দা কথা জয়ন্ত টিমে থাকছে কি থাকছে না?'

অল্পবুদ্ধির লোকেদের নিজেদের সম্পর্কে আস্থাটা বাস্তবের চেয়ে খানিকটা বেশি পরিমাণ বলে, তারা সহজেই অন্যের কথায় ক্রুদ্ধ হয়। ভবেনদা খেঁকিয়ে উঠল, 'জয়ন্ত না খেললে তুমিও কি খেলবে না?'

—'না। খেলব না। আরো সবাই যাতে না খেলে তারজন্য প্লেয়ারদের বলব। আমার বিশ্বাস তারা আমার কথা শুনবে।'

—'তেমন অধিকার তোমার নেই।' রাগে ভবেনদা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ধুতির কোঁচাটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ঘরের বাকিরা চুপ করে ওদের দু'জনকে দেখে যাচ্ছে।

—'আপনাদেরও কোন অধিকার নেই কারো সম্বন্ধে ফলস্ কতকগুলো অভিযোগ এনে শাস্তি দেবার। আপনারা যে বলছেন জয়ন্তর পাঁচ হাজার টাকা আর টিভি পাওয়ার কথা গোপন সূত্র থেকে জানতে পেরেছেন, আপনারা সেই সোর্স ডিসক্লোজ করুন, নয়তো পুরো ব্যাপারটা চেপে যান।'

যোগোকে দেখে সে সময় কেশর ফোলানো পাগলা ঘোড়ার মত লাগছিল। ও বেমক্কা একটা প্রচণ্ড ঘুসি সেণ্টার টেবিলটায় মারতেই টেবিলের ওপর যে দাবার ঘুঁটিগুলো ছিল, সব কটা একসঙ্গে ছিটকে পড়ল। যোগো চেঁচিয়ে বলল, 'জয়ন্তর নাম করে আপনারা আমাদের সব প্লেয়ারকে ইনসাল্ট করছেন। আমরা প্লেয়াররা নিজেদের এলেমে করে কম্মে খাই। আপনারা ফুটবলে জন্মে পা না ছুঁয়েই বিরাট ক্লাবের আরো বিরাট কর্মকর্তা হয়ে যান। নিজেদের কখনো খেলার সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে প্লেয়ারদের সম্বন্ধে ভালো মন্দ যা কিছুই বলুন না কেন, বুঝে সমঝে বলতেন?' যোগোর গলাটা কাঁপছিল থরথর করে, শেষদিকে স্বরটা ভেজা ভেজা হয়ে গেল।

ভবেনদা উত্তেজিত হয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, পি. সি. ঘোষ পাশ থেকে তার হাতটা টেনে ধরল, 'আঃ ভবেন! শান্ত হও।—দেখো যোগনাথ, এটা সেন্টিমেণ্টের ব্যাপার নয়। যতক্ষণ পদে বহাল রয়েছি, তা যোগ্যতা থাক আর নাই থাক, ততদিন ক্লাবের ভালো মন্দ আমাদের মত করে আমরা ভাববই। একটা কথা মনে রেখো, আমরা কেউই

জয়ন্তর শত্রু নই। তোমাকে আর জয়ন্তকে আমার সুপারিশেই ক্লাবে নেওয়া হয়েছিল। যাইহোক আমরা পুরো বিষয়টা আর একবার ভেবে দেখব। তুমি বরং এখন বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম কর।'

যোগো তাও গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দেখে বিভূতিদা বলল, 'তুই বাড়ি যা, যাতে একটা সুবিচার হয়, সেটাই আমরা দেখব।'

ছোট্টুদা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, এবার খানিকটা আপন মনে বলল, 'আমি মুখে যাই বলি, জয়ন্ত ঘুস খেয়েছে এমন কোন প্রমাণ আমার কাছে নেই। কারোর কাছেই বোধহয় নেই। তবে জয়ন্ত দোষ, করেছে, তার শাস্তি সে এড়াবে কী করে?,

পি. সি. ঘোষ হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মত সোফা থেকে উঠে জানলার কাছে চলে এল, 'আমার বড় সাফোকেশন হচ্ছে। আমি খোলা জানলার পাশে একটু নিরিবিলিতে বসতে চাই।'

ছোট্টুদা পি. সি. ঘোষের চোখে চোখ রেখে বলল, 'চলুন আপনাকে পুরী বেড়িয়ে নিয়ে আসি। সমুদ্রের ধারে আপনার হাঁপানির মত ভাবটা কম হবে। আর সমুদ্রের বিশালতার সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের মনের উদারতা বাড়ে। আমরা সেখানে বসে জয়ন্ত সম্বন্ধে ডিসিশন নেব।'

পি সি. ঘোষ একটু চমকে গিয়েছিলেন প্রথমে, ছোট্টুকে কিছুতেই পুরোপুরি নিজের ফরে পাওয়া যায় না। ব্যাটা বিবেকের নির্দেশ টির্দেশ-গুলো সবসময় না হলেও হঠাৎ মেনে ফেলে। পি. সি. ঘোষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন, মনের ভাব গোপন করতে না পারলে, আর যাই হোক ওপরে ওঠা যায় না। ছোট্টুর কথায় পরম আপ্যায়িতের মত বলল, 'ছোট্টু, তুমি ভালোবাসো বলেই, না হলে এই বুড়োর শারীরিক কষ্টে বিচলিত হয়ে তোমার মত আর কেউ তাকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেনি, এমন কি বাড়ির লোকেরাও নয়।'

যোগো দেখল আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা অর্থহীন। ও পা টেনে টেনে বেরিয়ে পড়ল।

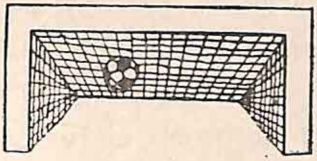
বিকাশ নন্দীর সঙ্গে ততক্ষণে জয়ন্তর আড্ডা বেশ জমে উঠেছে। বিকাশ প্রচুর জলখাবারের ব্যবস্থা করেছিল, জয়ন্ত তৃপ্তি করে খেয়েছে।

ওরা দু'তিন ঘণ্টা গল্প করেছে। তার মধ্যে একটাও কথা ফুটবল নিয়ে হয়নি। বিকাশ ভালো ম্যাজিশিয়ান—পেশাদার নয়, সখের। ওদের বেশির ভাগ কথাবার্তাই ম্যাজিক নিয়ে হল, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জয়ন্ত শ্রোতা।

প্রথদিমকে জয়ন্তর একটু জড়তা ছিল। কিন্তু এখন সে পরম নিশ্চিন্তে সোফায় গা এলিয়ে বসে আছে। তাই বিকাশ যখন হঠাৎ বলল, 'একটা কথা জানার কৌতূহল আমার প্রবল, তাই আপনাকে খুঁজছিলাম। শিল্ড ফাইনালে আপনি সেমসাইড গোল করলেন। সে খেলা আমি দেখেছিলাম। অসংখ্য দর্শকের মতো আমিও বড় বিচলিত হয়েছিলাম। সে রাতে বাড়ি ফিরে যেতে পারিনি। কিন্তু পরে নিজের দুঃখটা চলে গেল। তখন থেকে ভাবছি, গোল দেওয়ার পর আপনার মনের অবস্থাটা কী? এটা আমার একটা হবি বলতে পারেন—মানুষ এক একটা সঙ্কট মুহূর্তে ঠিক কিভাবে রিঅ্যাক্ট করে সেটা জানতে ইচ্ছে করে।' জয়ন্ত তখন বিচলিত হয়ে খোঁচা খাওয়া সাপের মত লাফিয়ে উঠল। তারপর মুখ নিচু করে ধীরে ধীরে বলল, 'আমি তারপর থেকে চোখ বুজলেই দেখতে পাই, সেণ্টার ফরোয়ার্ড থ্রু করল, রাইট আউট এগিয়ে আসছে। আমার শরীরটা জল কাদার মাঠে বেসামাল হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আর বুটের ধাক্কায় বলটা ·····আমাদের গোলী সৌমেন অনেকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। আমি সচেতন বা অচেতন ভাবে এ দৃশ্যটা মনের মধ্যে অন্তত দশ হাজার বার দেখেছি।'

বিকাশ বলল, 'লোকে কে কী বলছে, সেটা ছেড়ে দিন, আপনি নিজের মনে পাপমুক্ত তো?'

জয়ন্ত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তারপর খুব অস্ফুট স্বরে, বলল, 'জানি না! জানি না!!'



যোগো বাড়ি ফেরার প্রায় ঘণ্টা খানেক বাদে জয়ন্ত ফিরল। দু'জনে দু'জনকে দেখল। কিন্তু কোন কথা হল না। যোগো জয়ন্তর বিষয়ে কথাবার্তা বলতেই গিয়েছিল, আলাপ আলোচনা কেমন হল জানার ইচ্ছে জয়ন্তর থাকাটা স্বাভাবিক, কিন্তু জয়ন্ত ভাবল যোগো যখন নিজে থেকে কিছু বলছে না, তার মানে বলার মত ভাল কথা কিছু নেই।

যোগো একসময় উঠে পড়ে বলল, 'জয়ন্ত তুই ততক্ষণ বিশ্রাম কর। বাইরে থেকে এলি, আমি স্নান করতে যাচ্ছি। দু'জনে স্নান খাওয়া করে তোফা একটা ঘুম লাগাব, তারপর সন্ধ্যে গড়িয়ে গেলে চৌরঙ্গীতে গিয়ে নাইট শোতে কোন একটা ফিল্ম দেখব।'

জয়ন্ত ভাবলেশহীন মুখে যোগোর কথা শুনল। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল যোগোর, ছোট্টুদা তাকে জয়ন্তর একটা চিঠি দিয়েছে। যোগো প্যাণ্টের পকেট থেকে সামান্য দোমড়ানো খামটা বের করে জয়ন্তর হাতে দিল। যোগো জয়ন্তর মুখের দিকে তাকিয়েছিল, ভেবেছিল খুশীর ঝিলিক দেখবে, কিন্তু তার বদলে গম্ভীর হয়ে গেল। চিঠিটা নিতে জয়ন্তর হাতটা যেন কাঁপছিল, যোগোর মনে হল তার সামনে চিঠিটা খুলতে ইতস্তত করছে জয়ন্ত, যোগো ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

চিঠিটা যে মা'র লেখা সেটা জয়ন্ত হাতে নিয়েই বুঝেছিল। মা'র কাছ থেকে সে এই প্রথম চিঠি পেল। এর আগে চিঠি লেখার মত কোন কারণ ঘটেনি। চিঠি খুলতে ভয় পাচ্ছিল জয়ন্ত, মা কি লিখতে পারে? মা'র কথা মনে হলেই ও দেখতে পায় মালদহের বাড়ির সঙ্কীর্ণ অন্ধকার রান্নাঘরে মা'র ক্লান্ত দুর্বল চোখ দুটো আশার আলো জ্বেলে তাকিয়ে আছে। যখন আর কেউ থাকত না শুধু মুখোমুখি মা আর জয়ন্ত, মা

তার কাঠির মত আঙ্গুলগুলো জয়ন্তর মুখে বুলিয়ে দিত, 'তুই পারবি খোকা, আমি জানি তুই পারবি। লেখাপড়া শিখে চাকরি বাকরি তো সবাই করে, ওতে আর বাহাদুরী কী? তুই যদি খুব বড় খেলোয়াড় হোস, কত নাম হবে, সকলে বলবে ওই দেখ জয়ন্ত মিত্রের মা যাচ্ছে। আর কিছু চাই না রে আমার ছেলে মেয়েরা বড় হলে, ভাল হলে, এখনকার এই কষ্টগুলো তখন সব মুছে যাবে।'

জয়ন্তর তখন কান্না পেত, মা-কে খুশী করার জন্য সেই মুহূর্তে তার এক বিরাট কিছু হয়ে যেতে ইচ্ছে করত। জয়ন্ত এখন বুঝতে পারে, মা স্বপ্ন দেখতে জানে, সকলের এই গুণটা থাকে না। মালদহে থাকার সময় সারা সংসারটা জুড়ে তীব্র হাহাকার, কষ্টের চাপ যত বাড়ত, মা'র স্বপ্নের রঙ তত উজ্জ্বল হত।

মা চিরটাকাল খুব মৃদু স্বরে অল্প কথা বলে। রান্নাঘর আর কলতলার বাইরে বাকি পৃথিবীটাকে হেলা ফেলায় নির্বাসন দিয়েছে। জয়ন্ত সেদিন কলকাতার ফ্ল্যাটে মাকে প্রথম নিয়ে এল, সেদিন শ্রাবণের আকাশ মেঘে মেঘে ঘন কৃষ্ণ হয়েছিল। মা বিহ্বল মুখে তিন কামরার ফ্ল্যাটটা ঘুরে ঘুরে দেখল। তারপর মাঝখানের ঘরের জানলায় এসে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখতে দেখতে বলল, 'খেলা মানুষকে এতো দেয়!' মা'র কথায় দুরন্ত বিস্ময়। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, খোলা জানলা দিয়ে হাওয়া এসে মা'র শাড়িটা ফুলিয়ে তুলছিল। জয়ন্তর দিকে না তাকিয়েই খানিকটা স্বগতোক্তির মত বলল, 'যারা তোকে এত দিয়েছে, তাদের এরও অনেক বেশি ফিরিয়ে দিস খোকা।' মা জয়ন্তর বুকে মুখ রেখে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল, জয়ন্ত বুঝতে পারে, দীর্ঘদিন একটা প্রবল চাপের মধ্যে থাকার পর হঠাৎ সমস্ত বাধা একসঙ্গে খসে পড়ছে, নানারকম আবেগ একত্রে মিলেমিশে কান্না হয়ে ঝরে পড়েছে। এ কান্না দুঃখের বা সুখের নয়, এর জাত আলাদা। মা সেদিন অনেক কথা বলেছিল, ঠিক গুছিয়ে বলা কথা নয়, তবে জয়ন্ত যা বুঝেছে, তা হল যাকে ভালবাসো, যার জন্য এত কষ্ট সহ্য করেছো, সেই ফুটবলের প্রতি আনুগত্য যেন ঠিক থাকে। কোন প্রলোভনের চাপে পড়ে তা লঙ্ঘন করো না।

জয়ন্ত এতদিন মনের গভীর থেকে জেনে এসেছে সে সৎ, যে ভুতুড়ে গোলটার জন্য তাকে দায়ী করা হচ্ছে, তাতে সত্যিকারের তার কোন হাত ছিল না। তার পা-টা পিছলে না গেলে, এমন একটা বিশ্রী ঘটনা নিশ্চয়ই হতো না। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, নানারকম কথা আর চিন্তার টানা পোড়েনে তার এটাও মনে হচ্ছে আজকাল, যতটা ভাবছে, সত্যিই কি সে ততটা নির্দোষ ?

মা'র কাছ থেকে যদি তেমন কোন অভিযোগ আসে ? ভাবতে পারে না জয়ন্ত, তাহলে তো প্রতিরোধের শেষ দুর্গটাও ভেঙ্গে পড়ল। জয়ন্ত কাঁপা হাতে চিঠিটা খুলল।

'স্নেহের খোকা, শুনেছি যেখানে আছো, ভালোই আছো, তবু পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারি না। তুমি হয়ত এতদিনে সব খবরই জানো, বাধ্য হয়েই কোনক্রমে পালিয়ে এসেছি। বাড়িতে তোমার বাবা আর বিল্টু আছে। পারলে তুমি একবার আমার সঙ্গে এখানে এসে দেখা করো।

খোকা, একটা কথা কখনো ভুলো না, লড়াই করতে ভয় পেলে চলবে না। মনে যে কোনো দিক থেকে দ্বিধা, সঙ্কোচ বা দুর্বলতা এলে নিজের শৈশব কৈশোরের কষ্টের দিনগুলোর কথা মনে করো ; তাহলে বল পাবে। ফুটবলার হিসাবে তোমাকে জয়ী হতেই হবে, হেরে যেও না। ইতি—

আশীর্বাদিকা মা

চিঠি পড়ে মনের মধ্যে থেকে একটা পাথর নেমে গেল। মা তাকে বাতিল করে দেয়নি,তাকে মর‍্যাল সাপোর্ট দেবার আপনজন তার রয়েছে, তবে আর ভয় কিসে ?

যোগো বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরে চুল আঁচড়াচ্ছিল, জয়ন্ত বলল, 'আজ তোকে আমি ট্রিঙ্কাতে ডিনার খাওয়াবো। যোগো আয়না দিয়ে জয়ন্তর দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকালো। 'খুশী একেবারে উপচে পড়ছে ! কসমস ক্লাব থেকে চিঠি এসেছে নাকি ?

—'না। আমার মা'র চিঠি।' উদ্ভাসিত মুখে বলল জয়ন্ত।

যোগো খেঁকিয়ে বলল, 'মা কি জানে তার খোকার খেলার বারোটা বেজে গেছে ?'

জয়ন্তর মুখে এখন একটা খুব সরল হাসি, পি.সি. কী বলল, আমাকে দল থেকে ছেঁটে ফেলা হবে ?'

—'আমি বাড়ি ফেরার মিনিট পনেরো বাদে একটা ফোন এসেছিল। ভবেনদার বাড়ি থেকে পি. সি. ঘোষ জানিয়েছে,কমিটি মিটিঙে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হবে।'

জয়ন্ত নির্লিপ্তভাবে বলল, 'আমি জানি ওরা আমাকে তাড়িয়ে দেবে। নেকস্ট সিজনে আমি কোন ছোট দলে সই করব। কোকোদাকে গিয়ে ধরে পড়ব, এক সময় তো উনি আমার গুরু ছিলেন, বললো খিদিরপুর ক্লাবে একটা চান্স করে দিন। দেখিস্ আমাকে ঠেলতে পারবেন না।' জয়ন্ত এমন ভাবে কথাগুলো বলছিল, তার জীবনে এখন যেন একটাই লক্ষ্য, ছোট দলে জায়গা পাওয়া। যোগো জয়ন্তর এই ভাবটা দেখে বিরক্ত হল।

*

বিকেলে ঘুম ভেঙ্গে জয়ন্ত দেখল পশ্চিম আকাশটায় ভারী সুন্দর দুধে আলতা ধরনের রঙ হয়েছে ; এমন রঙের আকাশ আর কখনো সে দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। জয়ন্ত ছাদে বেরিয়ে এসে বেশ কিছুক্ষণ খুশী মনে আকাশ-টাকাশ দেখল। আশেপাশের বাড়ির ছাদে কয়েকটি বালক ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। একটি অষ্টাদশী কিশোরী পাশের ছাদে তার বান্ধবীর সঙ্গে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সদ্য দেখা হিন্দি সিনেমার গল্প করছে। প্রথমদিকে এসব টুকরো টুকরো দৃশ্য ও সংলাপের প্রতি মনোযোগী হলেও, খানিকবাদে সে নিজের মনের মধ্যে একলা হয়ে গেল।

মা তাকে লড়াই করে ফুটবল জগতে তার জায়গাটা টিকিয়ে রাখতে বলেছে। মা'র কাছ থেকে এমন একটা উৎসাহসূচক কথা শুনে ও মনের মধ্যে বেশ বল পাচ্ছে। কিন্তু লড়াইটা যে ঠিক কোন দিক থেকে কিভাবে বা কার সঙ্গে শুরু করবে সেটাই যেন মাথায় ঢুকছে না।

আসলে মা'র কাছ থেকে জীবনে প্রথম চিঠি পেল, তাছাড়া অনেকদিন সে মায়ের সঙ্গ ছাড়া, বিপদ আপদে ছোটো বড় সকলেই একটা সহানুভূতি আর সান্ত্বনার আশ্রয় খোঁজে, এই চিঠিতে যেন সেই অভাবটা অনেকটা মিটেছে—এসব নানাবিধ কারণে জয়ন্ত মনে মনে খুব খুশী। সঙ্কটের মেঘে মনের আকাশটা ঢাকা থাকলেও তারই ফাঁক দিয়ে খুশীর ঝিলিক দিচ্ছে।

যোগো নিচ থেকে ওপরে এসে বলল, 'এই জয়ন্ত! তোর বাবা এসেছেন।'

জয়ন্ত সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে বসবার ঘরের পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল বাবা সোফার ওপর আলগোছে বসে আছেন, মুখটা ঝুলে পড়েছে, চশমটা ঠিক জায়গা থেকে নাক বেয়ে অনেকটা নেমে এসেছে। জয়ন্ত বুঝতে পারলো বেশ কিছুদিন ধরে বড় বেশী অত্যাচার চলছে, যার জন্য মানসিকভাবে তৈরি নয় তার বাবা।

জয়ন্ত ঘরে ঢুকে দাঁড়াল, বাবা সেটা টের পেল না, মাথা নিচু করে অন্যমনস্কভাবে বসে রইলেন। জয়ন্ত দেখল বাবার নীচের ঠোঁটটা থেকে থেকে থিরথির করে কাঁপছে। জয়ন্ত অস্ফুট স্বরে ডাকল, 'বাবা।'

ওটুকু আওয়াজেই বাবা প্রচণ্ড রকম চমকে উঠলেন, তারপর জয়ন্তকে দেখে, খোকারে—!' বলে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

জয়ন্ত বারবার পাশে বসে পিঠে হাত রাখল। জয়ন্তর বাবা রমেনবাবুর সামলে উঠতে একটু সময় লাগল।

জয়ন্ত বলল, 'মা'র চিঠি পেয়েছি। ওরা কেমন আছে কিছু লেখে-টেখেনি। ভাবছি রাঁচী যাব। তোমরাও চল। এখন ওখানকার আবহাওয়াটা ভাল।

রমেনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বাড়ি কে দেখবে? এই ঝামেলায় রাস্তার দিকে কাচের শার্সিগুলো আর কিছু রাখেনি। শিল্ড ফাইনালের দিন ওই ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ার মিনিট পাঁচেক পরেই ঝাঁক ঝাঁক ইট ছুটে, আসে।' জয়ন্ত লক্ষ্য করলো তার দেওয়া সেমসাইড গোলের উল্লেখটা বাবা 'ওই ব্যাপারটা' বলে এড়িয়ে

যেতে চাইলেন।

'আমার কি মনে হয় জানিস খোকা—তুই এবার না হয় খেলাটা ছেড়ে দে। খেলার জন্য চাকরি-বাকরি পেয়েছিস। শেষ কয়েক বছরে যা রোজগার করেছিস, তার অর্ধেকও আমার সারাজীবনের রোজগার নয়। কেন আর ঝামেলার মধ্যে থাকবি?'

জয়ন্ত খুব শান্ত স্বরে বলল, 'মা চিঠিতে আমাকে লিখেছে লড়াই চালিয়ে যেতে, ফুটবলার হিসাবে নিজের স্থান বজায় রাখতে।—তাছাড়া আমি এখন যদি সরে যাই, লোকে ভাববে সত্যিই আমি দোষী, এরপর থেকে আমাকে প্রকাশ্যে আঙুল তুলে দেখিয়ে নোংরা কথা বলবে।'

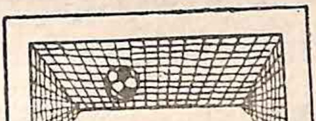
—'তোমার সঙ্গে আমরা বাড়ি শুদ্ধ লোক ভুগছি। তোমার মা চিরকালই হুজুগে। তোমার খেলাটেলা নিয়ে ছেলেমানুষিটা তো আর নতুন নয়। সে কি বলেছে, সেটাকেই তুমি বড় করে দেখলে?'

জয়ন্ত বাবার কথায় বিরক্ত বোধ করলেও, স্বাভাবিক সৌজন্যবোধে সেটুকু চেপে রেখে বলল, 'বাবা আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।··· তুমি কিছু টাকা পয়সা এনেছ? আমার দরকার। আপাতত খরচ-খরচা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পয়সা তুলে চালাও। আমি একটু 'থিতু' হয়ে নিই, তারপর সব দেখা যাবে।'

বাবা চলে যাওয়ার পর জয়ন্ত বসার ঘরে আলো নিভিয়ে সোফার ওপর আধশোয়া হয়েছিল। যোগো একটু বেরিয়েছে, বলে গেছে শিগগিরই ফিরবে। এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল, বাজতেই থাকল, জয়ন্ত আশা করেছিল কাছাকাছি কেউ থাকলে এসে ধরবে। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়েই জয়ন্ত গিয়ে ফোনটা তুলল। জয়ন্তর গলা পেয়েই ওদিক থেকে কুশ্রী গালাগালির একটা স্রোত বয়ে গেল যেন, সঙ্গে শাসানি, প্রাণনাশের হুমকি। জয়ন্ত কিছু না বলে মন দিয়ে সব কিছু শুনল। গলাটা তার চেনা। ছেলেটা ভবেনদার চেলা। প্লেয়ারদের আশে-পাশে ঘোরে। এমনিতে কিছু না, তবে কথায় বলে খুঁটির জোরে ভেড়া লড়ে, ওরও তাই। ক্লাবে ভবেনদার পজিশনের ওঠা-নামায় ওর

হম্বিতম্বার হেরফের ঘটে। টেলিফোনটা নামিয়ে রাখার আগে জয়ন্ত নির্বিকারভাবে শুধু বলল, 'গোবিন্দ, টেলিফোনেও লোকের গলা চেনা যায়। কথা বলার সময় মুখের সামনে একটা কাচের খালি গ্লাস রাখলে স্বরটা বদল হত। তুই একটা ওয়ার্থলেস, তোর পুরো এফার্টটা মাটি হয়ে গেল। তোর ভয়ে ফুটবল খেলা আমি কখনই ছাড়ব না, তোর গুরু ভবেনদার ভয়েও নয়।'

গোবিন্দর এমনিতে বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম, ওপর ওপর এমন একটা চাল দেখায়, যেন কি না কি। ও জয়ন্তর দিক থেকে পাল্টা আক্রমণের মুখোমুখি হয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখল। জয়ন্ত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে নিজের মনে বলল, লড়াই মানে এই সবই। এখন ছুঁচো-টুঁচোর সঙ্গে লড়তে হচ্ছে, এক সময় বিষাক্ত কালকেউটের মুখোমুখি তাকে হতে হবে। সেটাই আসল।



প্রকাশচন্দ্র ঘোষ সংক্ষেপে পি. সি. ঘোষ এখন তার দক্ষিণ কলকাতার বাড়ির দোতলার জানালা দিয়ে অত্যন্ত বিরক্ত মুখে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। পি. সি-র চোখের সামনে শরতের একটি মনোরম উজ্জ্বল সকাল ধীরে ধীরে তার রং রূপ রস নিয়ে উন্মোচিত হচ্ছে। বিবেকানন্দ পার্কে কয়েকটি ছেলেমেয়ে দু'তিনটি ভাগে দৌড়ঝাঁপ করছে। বাড়ির লাগোয়া ছোট্ট লনের মধ্যে শিউলি গাছ থেকে একটা মৃদু সৌরভ বাতাসে মিশে আছে। একটু পরেই সোনালী রোদে চার-দিকটা ঝলমল করে উঠবে, সারা প্রকৃতি জুড়ে একটা পরিপূর্ণতার ছায়া। যেটা এই ইট কাঠের শহরেও দিব্যি অনুভব করা যাচ্ছে। কিন্তু পি. সি-র চোখ দুটো কোঁচকানো, খানিক আগে চিরতার জল খেয়েছেন, সে সময়কার মুখের বিকৃতিটা এখনো কাটেনি। ক্রনিক পেটের রুগী-দের অধিকাংশ সকালটাই অস্বস্তি ও অসন্তোষের মধ্যে কাটে। চিরা-

চরিত সেই সব ঝামেলা ছাড়াও আজ একটা বাড়তি চিন্তা তাকে পীড়িত করছে।

জয়ন্তকে নিয়ে আজ ক্লাবের অফিশিয়াল মিটিং। মিটিং-এর ব্যাপারটা কিছু নয়। ওটা করতে হয় বলে করা। নাহলে পি. সি. যা বলবেন সেটাই চূড়ান্ত। অন্তত গত দশ বছর ধরে তাই হচ্ছে। জয়ন্ত সম্বন্ধে ডিসিশন তার নেওয়া হয়ে গেছে। এখন সেভাবে কাজটা করতে পারলেই হয়। মিটিং একটা ডাকতে হয় বলেই ডাকা। কিন্তু বলতে গেলে প্রায় উষাকালে রতুয়ার কাছ থেকে একটা ফোন পেয়েছেন। তারপর থেকেই মেজাজটা সুবিধের নয়। রতুয়াকে তিনি একটা বিশেষ কাজে কদিন ধরে লাগিয়েছেন।

অভ্যাস মত খানিক্ষণ খালি হাতে ব্যায়াম করলেন, একটু বিশ্রাম, চৌবাচ্চার জলে স্নান, তারপর পুজোয় বসা—নিত্যদিনের এই কাজ-গুলো প্রাণহীন যন্ত্রের মত করে গেলেন। কোন কিছুতেই মন লাগল না। মনটা অন্য জায়গায় পড়ে আছে।

পুজো-আচ্চা শেষ করে সোজা পেছনের বারান্দায় চলে গেলেন। কয়েকটা বেতের চেয়ার আর একটা টেবিল। সকালের কাগজ এসে গেছে, টেবিলের ওপর বাংলা ইংরেজি গোটা চারেক কাগজ, টিকোজি দিয়ে ঢাকা ছোট্ট টি পটে চায়ের লিকার। দুধ আর চিনির পাত্র। সেঁকা রুটি, মাখন, জ্যাম, মর্তমান কলা, ডিম, কর্ন ফ্লেকস, ছোট একটা পাত্রে একটু মধু, দু'চার টুকরো মিছরি। এত কিছু পি. সি খান না—তবে আয়োজনটা থাকে। ক্রনিক পেটের রোগ থাকায় অধিকাংশ দিনই এক কাপ চা আর একটা ড্রাই টোস্ট খেয়ে খাওয়ার ইচ্ছে চলে যায়। আজ সব কিছুর দিকেই প্রবল বিতৃষ্ণায় তাকালেন। কাজগুলো নিয়ে খানিক নাড়াচাড়া করলেন, ছবি দেখলেন, হেডিং পড়লেন। তারপর আলগোছে আধ কাপ মত চায়ের লিকার ঢেলে চিনি দুধ না মিশিয়েই চুমুক দিলেন। অনিলবাবু ফাইলপত্র নিয়ে এসে গেলেন তার মধ্যে। এটাই তার আসার সময়—ব্যবসার কাগজপত্রগুলো খুঁটিয়ে দেখেন পি. সি। পৈতৃক ব্যবসা, পি. সি-র আমলে আরো কিছু বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। অনিলবাবুর

দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন ইচ্ছে করছে না। লাঞ্চের পর অফিসে বসে দেখব।'

অনিলবাবু শুধু জরুরী বলে ছটো চেক সই করিয়ে নিয়ে গেলেন।

তারপর আবার একা পি. সি। বারান্দার লতাপাতাআলা রেলিংয়ের ভেতর দিয়ে রোদ এসেছে, পায়ের কাছে নক্সাদারী ছায়া। পি. সি ভাবলেন যোগো আর জয়ন্তকে একসঙ্গে দলে এনেছিলেন। লোক বলে পি. সি পাক্কা জহুরী। সাচ্চা জহরৎ চেনার ক্ষমতা তার ভালো ভাবেই আছে। কলকাতায় থাকলে তো বটেই এছাড়াও ব্যবসার কাজে যখন যেখানে যেতে হয় ফুটবলটা সামনে পড়লে তিনি দেখেনই। তাছাড়া ডুরাণ্ড, রোভার্স, সন্তোষ ট্রফি এসব তো আছেই। পি. সি ছোট বড় কোন খেলাকেই অবহেলা করেন না। তার ধারণা কোথায় কোন্ রত্ন ছাইচাপা পড়ে আছে কে জানে। জয়ন্তর দিকে অনেকদিন থেকেই নজর ছিল। এখানে আসার আগে বড় ক্লাবে খেলে এসেছে। মানিকদের ক্লাবে যখন খেলতো তখন থেকেই পি. সি জয়ন্তকে বেছে রেখেছিলেন, কিন্তু একটু গড়িমসির ভাব দেখিয়েছিলেন, তাই সেবার জয়ন্ত হাতছাড়া হয়ে যায়। না হলে আরো ছ'বছর আগেই জয়ন্ত তাদের ক্লাবের জার্সি পরতো। জয়ন্তটাকে বড় আশা করে এনেছিলেন, গতবছর পায়ে এমন চোট লাগল যে, পুরো সিজনটাই প্রায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কাটল। খেলতে নামা মানেই পায়ে ইনজেকশন দিয়ে নামতে হত। ভালো খেলেনি গতবছর, তবু ওরই মধ্যে মাঝে মাঝে ভেলকি দেখিয়েছে। তবে এবার সিজনের শুরু থেকে জয়ন্ত একেবারে ফিট। এবার লিগে ও যা খেলেছে, সেটা বহু ক্ষেত্রে প্রত্যাশার অনেক ওপরে। 'কিন্তু জয়ন্তবাবু শেষ পর্যন্ত তুমি এক সের ছধে এককোঁটা চোনা ফেলে দিলে।'

বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে বসে আছেন পি. সি। মনে মনে একটা বিচারশালার কথা ভাবছেন। পি. সি সরকারী পক্ষের কৌঁসুলি। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জয়ন্ত।

অভিযোগটা আসামীর বিরুদ্ধে ঘুষ খাওয়া বা ইচ্ছাকৃতভাবে গোল

দিয়ে ক্লাবের সঙ্গে বেইমানী করা, তা নয়। অভিযোগটা আরো জটিল ও সূক্ষ্ম।

জয়ন্ত তুমি পি· সি-র ইচ্ছের বাদ সেধেছো। সবসময় সব কিছু অত যুক্তি তর্ক দিয়ে বিচার করা যায় না, সবসময় মানবিকতাকেও প্রাধান্য দেওয়া যায় না। তোমার গোলে দল ফাইনালে হেরেছে—মানছি অ্যাক্‌সিডেন্ট, কিন্তু অ্যাক্‌সিডেন্ট বলে তো কেউ গোলটা নাকচ করে দেবে না। ক্ষমা বড় মহৎ জিনিস, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কেইবা মহত্ত্ব আশা করে? সাধারণ মানুষের মন নিয়ে তোমাকে ক্ষমা করা যায় না জয়ন্ত।'

এমন সময় পি. সি-র মনের মধ্যেই আর একটা মন কথা বলে উঠল, 'ফুটবল খেলতে গেলে এ ধরনের বিপত্তির কথাগুলো মনে রাখতেই হবে। নির্বোধের মত একজনের কেরিয়ার নষ্ট করে দিও না।

এক পি. সি আর এক পি. সি-র দিকে ফুঁসে উঠল, 'শাট আপ য়্যু হামবাগ। কে কার কেরিয়ার নষ্ট করছে। দল জিতলে প্লেয়ারের দাম বাড়ে, কর্মকর্তাদেরও বাড়ে। জয়ন্ত সকলের রেপুটেশনে কালি ছিটিয়েছে।'

—'পি. সি তুমি একান্তই নির্বোধ। স্বচ্ছ মন আর চিন্তা নিয়ে তুমি ময়দানে আসোনি।'

—'ক্লাব নিয়ে আমি কত ভাবি তা জানো। রাতে ঘুমুতে পারি না, প্লেয়ারের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াই। গাঁটের পয়সার কথা তো ছেড়েই দাও। ফুটবলের জন্য স্বার্থত্যাগ করেছি অনেক।'

—'ফুটবল নিয়ে তোমার ভাবনা, কূটনীতির ভাবনা। ক্লাব চালাতে গেলে পলিটিকস করতেই হয়, তুমি বেশ উঁচু দরের পলিটিশিয়ান। আর ক্লাব করে তুমি স্বার্থত্যাগ করছো কি স্বার্থসিদ্ধি করছো, সেকথা তোমার নিজেরই জানার কথা। জয়ন্তর যদি কোন ক্ষতি কর, তাহলে তুমি কিন্তু নিজের কাছেই ক্ষমা পাবে না।'

—'কে ক্ষতি করতে চায় তার?'

—'রতুয়া তবে যোগোর বাড়ির সামনে পাহারায় রয়েছে কেন?

আর আজ রতুয়ার ফোন পেয়ে তুমি এত উতলাই বা হলে কেন ?—রতুয়াটা মাথা-মোটা, ও যদি জয়ন্তকে আঘাত করে ?'

—'না !—জয়ন্তকে আমার চাই, ওর সাবস্টিটিউট প্লেয়ার শুধু আমাদের কেন, কলকাতার আর একটা টিমেও নেই।'

—'তবু তাকে তুমি শাস্তি দিতে চাইছো।'

—'আমার একটা প্ল্যান আছে। জয়ন্ত ভয়ের মুখে, চাপের মুখে আত্মসমর্পণ করবে। ছেড়ে দিতে চাইবে খেলার মাঠ। নিজে যে কাজটা করেছে, তার সম্বন্ধে তীব্র অনুশোচনা ও অপরাধবোধে মনের ভেতরটা ওর জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে, ঠিক সে সময়—।'

—'তুমি বরাভয় মুদ্রা দেখাবে, শান্তির জল ছিটিয়ে ওকে শীতল করবে। ওকে পরাজয় আর গ্লানির জগৎ থেকে টেনে তুলে আবার তার পুরনো জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করবে।...

বাঃ পি. সি—বাঃ ! একসেলেণ্ট ! আর কি বলবো বলো। পি.সি-র ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হবে। বলা যায় না মৃত্যুর পরে এই মহান ফুটবলপ্রেমীর নামে কলকাতা শহরে রাস্তার নাম কি একটা স্ট্যাচু তৈরির প্রস্তাবও জোরদার হয়ে উঠতে পারে।'

—'আজ সকাল থেকে আমার মনটা দুর্বল আর সেই সুযোগে তুমি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছো। জানোই তো আমি বিবেকের শাসন-টাসনগুলোকে বিন্দুমাত্র পাত্তা দিই না। তোমার কয়েকটা কাটা কাটা কথা আমাকে ঘায়েল করে দেবে ভেবো না, আমি চাই জয়ন্ত আমার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসুক। জয়ন্ত একটা উপলক্ষ্য মাত্র, ওর মনে একবার যদি ভয় ঢোকাতে পারি আর দশটা খেলোয়াড় তখন ম্যানেজমেণ্টকে ভয় করবে। শুধু আমার ক্লাবই নয় পাশের ক্লাবেও। শক্ত হতে না পারলে ওরা খালি পেয়ে বসতে চায়। নিজেদের বড় বেশী ইম্পর্ট্যাণ্ট মনে করে। দিন দিন ওদের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে।

রাত দশটার পর হয়তো ফোন করল, পরদিন সকাল ছ'টার ফ্লাইটে তার বোন দিল্লী না বোম্বে যাবে, এয়ারপোর্টে পৌঁছবার গাড়ি চাই—ভাগ্নে সাহেবী স্কুলে ভর্তি হতে পারছে না, একটু দেখতে হবে—বোনের

বিয়ে, গোটা আটেক গাড়ি, ড্রাইভার, পেট্রল শুদ্ধ ম্যানেজ করে দিতে হবে—এমন হাজারটা আব্দার, রাখতে না পারলেই বাবুরা বেঁকে বসবেন।'

—'এ অবস্থা একদিনে হয়নি, তোমাদেরও দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করা হয়নি। ক্লাব থেকে তোমরা ফায়দা ওঠাতে চেয়েছিলে, তোমাদের দুর্বলতা দেখে ওরাও তাই পেয়ে বসেছে। নিজের কথাই ভেবে দেখ না—তোমার পৈতৃক ব্যবসার আজকের এই রমরমা কিসের দৌলতে? ক্লাব আছে বলেই তুমি দোর্দণ্ড-প্রতাপ পি. সি ঘোষ। ক্লাব ছাড়লে ওই যে ফুটপাথে বসে খালি গায়ে যে লোকটা পিঠ চুলকোচ্ছে তার সঙ্গে তোমার তফাৎ কী?'

এমন সময় ঘরের ভেতর টেলিফোন বেজে উঠল। আচমকা আওয়াজে পি. সি নড়ে চড়ে বসলেন। মনের মধ্যে একটানা লড়াই করতে করতে তিনি এখন ক্লান্ত, বিরক্ত। চটি পরে পা ঘষে ঘষে ঘরে যেতে যেতে ভাবলেন, এতদিন প্রশ্নটা দেখা দেয়নি, ফুটবল জগতে কে বড়, খেলোয়াড় না কর্মকর্তা? কনফ্রণ্টেশনটা দিন দিন বাড়তে বাড়তে এখন দু'পক্ষকেই একেবারে মুখোমুখি রণাঙ্গনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। নীতিগতভাবে পি. সি এ লড়াইয়ে একজন সৈনিক, জিততে তাকে হবেই। বিপক্ষ শিবিরে আক্রমণের একটা সুযোগ পাওয়া গেছে জয়ন্ত মিত্রের দৌলতে।

ফোন তুলতে ওদিক থেকে রতুয়ার গলা শোনা গেল। 'স্যার, একটা হদিস পাওয়া গেছে। এই রোববার সকালে জয়ন্তর সঙ্গে রাস্তায় এক ভদ্রলোক দেখা করে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল, আপনাকে খবর দিয়েছিলাম—'

—'হ্যাঁ, তা কী হল?'

—'জয়ন্ত ভোরবেলা উঠে তার বাড়ি গিয়েছিল।'

—'সেকি, সে বাড়ি তো বলতে গেলে যোগোদের পাড়াতেই। তুমি যে এর আগে বললে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ও হঠাৎ ট্যাক্সি পেয়ে উঠে পড়ায় তুমি ওকে ফলো করতে পারো নি।'

—'ঠিক কথা স্যার, ট্যাক্সি নিয়ে ও প্রথমে ভবানীপুরে কুন্দনলালের গ্যারাজে গিয়েছিল। সেখান থেকে একটা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি নিয়ে এখন সে ভদ্রলোকের বাড়িতে এসেছে। মনে হচ্ছে কোথাও বাইরে যাবে।'

—'ক'জন যাচ্ছে ?'

—'ঠিক ঠিক বলতে পারছি না, তবে মনে হয় দু'জনের বেশি নয়।'

পি. সি মনে মনে ভাবল, এতদিনে বোধহয় ঘটনাটা ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছতে যাচ্ছে। উনি বললেন, 'রতুয়া, তোমাদের সব ব্যবস্থা আছে তো ? যেমন যেমন বলেছি ··।'

—হ্যাঁ স্যার।'

ফোনটা নামিয়ে রেখে পি. সি মনে মনে উত্তেজনাবোধ করলেন, অন্তত বেশ কিছুক্ষণ যদি জয়ন্তকে একটা অন্ধ ভয়ে এলোপাথাড়ি দৌড় করানো যায়···। একটা কথা ভেবে পি. সি হঠাৎ একটু বিচলিত হল। রতুয়াকে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া আছে, আর ও যেমন গোঁয়ার, তাতে যদি জয়ন্তর বড় বেশি ক্ষতি করে ফেলে ? ফেলতেও পারে। সেক্ষেত্রে তবে জয়ন্তকে হারাতে হবে। যাকগে, আরো জয়ন্ত আসবে, কিন্তু কর্মকর্তারা অত সহজে পাওয়া যায় না।

*

বিকাশ নন্দীর সঙ্গে জয়ন্তর প্রথম আলাপের পর থেকে রোজ দেখা হয়েছে। জমিয়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা হয়েছে। জয়ন্ত অনেককে যেসব জীবনের ব্যক্তিগত কথা বলেনি, সামান্য আলাপে তার অনেক কিছুই বিকাশকে অকপটে বলেছে। মাঝে মাঝে একটু আটটু খেলা-টেলা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মোট কথা বিকাশ এখন জয়ন্তর বন্ধু। বিকাশই একদিন প্রস্তাব দিল, 'চলুন একটা গাড়ি ভাড়া করে একটু বাইরে দূরে কোথাও বেড়িয়ে আসা যাক। যেদিন আপনার বিষয় নিয়ে ক্লাবের কর্মকর্তারা লেবু কচলাকচলি করবে, সেদিন আমরা সিক্সটি কি সেভেনটি কিলোমিটার স্পীডে গাড়ি ছুটিয়ে দেবো। দু'পাশে শরতের ধানক্ষেত সবুজ সতেজতা নিয়ে সঙ্গ দেবে।'

জয়ন্ত কুন্দনলালকে খুব ভালোভাবে চিনত। ভবানীপুরে গ্যারাজ আছে। ক্লাবের সূত্রেই আলাপ, জয়ন্ত তার কাছে গিয়ে গাড়ি ভাড়া চাইল। গাড়ি বিকাশ চালিয়ে নিয়ে যাবে, এটা ভেবেই জয়ন্ত গিয়েছিল। কিছুদিন আগেও বিকাশের একটা ঝরঝরে ল্যাণ্ডমাস্টার গাড়ি ছিল পেট্রল আর মেরামতির খরচায় জের বার হয়েগিয়ে সে গাড়ি প্রায় লোহার দরে বিক্রি করে দিয়েছে। কিন্তু কুন্দনলাল নিজের ড্রাইভার ছাড়া গাড়ি ছাড়তে চাইল না। অগত্যা ড্রাইভার-শুদ্ধ গাড়ি নিয়ে যখন বিকাশের বাড়ি পৌঁছাল জয়ন্ত তখন রোদ উঠে গেছে। কথা ছিল যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যায় ততই ভাল।

যোগোকে জয়ন্ত বিকাশ নন্দীর সব কথা-টথা বলেছে। গাড়ি করে বেড়াতে যাবার আগে যোগোকেও সে সঙ্গে আসতে বলেছিল। যোগো রাজি হয়নি। তবে জয়ন্তকে বারনও করেনি। যোগো ভবেনদার বাড়ি থেকে ফিরে আসার পরই বেশ একটু গম্ভীর হয়ে গেছে। জয়ন্তর সঙ্গে কথা-টথা প্রয়োজনের বাইরে খুব একটা বলতে চায় না। একদিন অফিস থেকে চারটে নাগাদ বাড়ি ফিরে খুব ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাত পা ছড়িয়ে জানালার ধারে বসেছিল। পড়ন্ত সূর্যের লালচে আলোতে যোগোর শরীরটা অদ্ভুত দেখাচ্ছিল, সে সময় ও হঠাৎ খুব বিষণ্ণ আর্দ্র স্বরে জয়ন্তকে বলেছিল, তোর সঙ্গে এক টিমে যদি না খেলতে পারি, তবে দেখিস্—ঠিক আমার খেলা খারাপ হয়ে যাবে।'

গাড়ি নিয়ে বিকাশের বাড়ি আসার পর বিকাশের তৈরি হয়ে নিতে মিনিট কুড়ি সময় লাগল। তার মধ্যেই বিকাশ গাড়ির ড্রাইভার বচন সিং-এর সঙ্গে দিব্যি আলাপ জমিয়ে ফেলল? বছর চব্বিশের শক্তপোক্ত চেহারার মানুষ বচন সিং। ছোট ছোট চকচকে চোখগুলো দেখলেই বোঝা যায় বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে, বেশ চটপটে। বিকাশ তাকে বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারটা এমনভাবে বুঝিয়ে দিল যে, বচন বিকাশের হাতে স্টিয়ারিং হুইল ছেড়ে দিতে সাগ্রহে রাজি হয়ে গেল। ঠিক হল বিকাশ আর জয়ন্ত সামনে বসবে। পেছনের সিটে বচন ঘুমোবে। গাড়ি নিয়ে রাত নেই দুপুর নেই সারা মুল্লুক টহল দিয়ে বেড়াতে হয় বলে যে কোন

সময়ই তার ঘুমের সময়। বচন বলল, একসঙ্গে চোদ্দ পনেরো ঘণ্টার ম্যারাথন ঘুমের রেকর্ডও তার আছে।

গাড়ি দু'দিনের জন্য ভাড়া করা হয়েছে। স্টিয়ারিং ধরে বিকাশ বলল, 'কোন দিকে?' বেড়াবার প্ল্যান হয়েছে, কিন্তু কোথায় যাবে সেটাই ঠিক করা হয়নি। কুন্দনলালের কাছ থেকে গাড়ি নেওয়ার সময় জয়ন্ত বলেছিল বিষ্ণুপুর যাবে, কিছু ভেবে বলেনি, বলতে হয় বলেই বলা। কিন্তু জয়ন্তর পরে মনে হয়েছে ছোট্টুদার সেজদির বাড়ি তো ওদিকেই।

জয়ন্ত বলল, 'কুন্দনলালকে বলে এসেছি, আমরা গাড়ি নিয়ে বিষ্ণুপুর যাব।' জয়ন্ত কথাটা এমনকাঁচুমাচু ভাবে বলল যে বিকাশ ফিক্ করে হেসে ফেলল, 'ঠিক আছে তবে তাই যাওয়া যাক্।'

আরামবাগে পৌঁছে বিকাশ গাড়ি থামাল। গাড়ি থেকে নেমে ও পিছন ফিরে কি যেন খুঁজতে লাগল। জায়গাটা বাজার এলাকা। অনেক দোকান টোকান সার বেঁধে। একটা দোকানে তারস্বরে রেডিওয় হিন্দি গান বাজছে। জয়ন্ত দেখল পিছনের সিটে ছ'ফুট লম্বা শরীরটা বিচিত্র কায়দায় দুমড়ে মুচড়ে বচন সিং গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এখানে চা-টা খাওয়া হবে তাই জয়ন্ত বচনকে ঠেলাঠেলি করে জাগাল। জাগল ঠিক বলা যায় না, একটু নড়েচড়ে চোখ বোজা অবস্থাতেই বলল, 'হালুয়া কচৌরি ঔর এক গ্লাস চায়ে।'

জয়ন্ত গাড়ি থেকে নেমে-পা টান করে আড়মোড়া ভাঙল। ততক্ষণে বিকাশ ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। খুব নিচু গলায় বলল, 'কলকাতা থেকে আরো দুটো গাড়ি সারাটা পথ আমাদের পেছন পেছন এসেছে। আসতেই পারে, সেটা কিছু আশ্চর্যের নয়, কিন্তু দুটো গাড়িই কোথায় গা ঢাকা দিল?'

বিকাশ কথাগুলো বলে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। ওর ধারণা ছিল জয়ন্ত গাড়ি ফলো করা হচ্ছে শুনলে হয়ত বড় বেশি নার্ভাস হয়ে পড়বে। কিন্তু বিকাশকে অবাক করে দিয়ে জয়ন্ত বলে উঠল, 'দ্যুৎ! সব বাজে সন্দেহ। আপনি যা ভাবছেন তা নয়।'

ওরা একটা বড় মিষ্টির দোকানে পেট ভরে খেল। বচন সিং-এর ঘুমটা জয়ন্তর ডাকাডাকিতে একটু ফিকে হয়েছিল, কিন্তু পরমুহূর্তে আবার সে গভীর ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেছে। দুজনের মিলিত ধাক্কা-ধাক্কিতে কিছু ফল হল না। অভুক্তই থেকে গেল।

*

রতুয়া যখন সকালে পি. সি ঘোষকে ফোন করেছিল, প্রায় তার কাছাকাছি সময়েই ছোট্টুদা আর এক জায়গায় একটা ফোন করেছিল। গলা উত্তেজনায় কাঁপছিল, 'বিভূতিদা, আজ সকালে জয়ন্ত কুন্দনলালের গ্যারাজ্ থেকে গাড়ি নিয়ে গেছে। বলেছে বিষ্ণুপুরের দিকে যাবে।'

—'তুমি এ ব্যাপারে এত উত্তেজিত হচ্ছো কেন?

--'জয়ন্ত গাড়ি নিয়ে চলে যাওয়ার পরই চোয়াড়ে গাল গুণ্ডা ধরনের একজন এসে কুন্দনকে জয়ন্তর ব্যাপারে প্রচুর জেরা করেছে। কুন্দন জানতে পেরেছে লোকটি পি. সি ঘোষের।'

—'তোমাকে এত সব খবর দিল কে?'

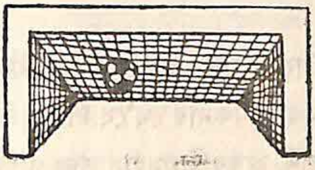
—'কুন্দন নিজেই ফোন করেছিল। ও অনেকদিন ক্লাবের সঙ্গে জড়িত, ওর মনে হয়েছে কিছু একটা গোলমাল আছে, তাই···।'

'আমারও মনে হচ্ছে কিছু একটা গোলমাল আছে। পি.সি যেভাবে ক্ষেপে আছে, একটা যদি বিপদ ঘটায়···! জয়ন্তর বিষয়টা নিয়ে পি. সি প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছে। বুড়ো হয়ে লোকের বুদ্ধিতে জড়তা আসে।···'

—'আমাকে কিছু একটা পরামর্শ দিন।'

--'পি. সি-র সেই লোক যদি জয়ন্তর গাড়ি ফলো করে,··· বিষ্ণুপুর পৌঁছবার পথে অনেক ফাঁকা জায়গা পাবে যদি ক্ষতি করার ইচ্ছে থাকে ···ছোট্টু তুমি বরং একটা কাজ করো, কুন্দনের কাছ থেকে আর একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়। জাস্ট একটা চান্স নিয়ে দেখো···জয়ন্ত সত্যি বিষ্ণুপুরের দিকে গেলে জোরে গাড়ি চালিয়ে ধরে ফেলা যাবে। আর হ্যাঁ তোমার তো চেলা-চামুণ্ডা অনেক, সঙ্গে দু'জন ষণ্ডা গোছের ···। পি. সি-র লোক বলছো যাকে, সেই লোকটাকে চেনো?'

—'না, ঠিক বুঝতে পারছি না। পি. সি ঘোষের যদি কোন দুষ্ট মতলব থেকে থাকে তো, একেবারে অচেনা লোককে দিয়েই কাজ হাসিল করাবে।'



জয়ন্ত চলন্ত গাড়ির জানালা দিয়ে দেখল, একটা পেট্রল পাম্পের পাশের এক টুকরো ঘেসো জমিতে জনা দশ বারো ছেলে প্রবল উদ্যমে ফুটবল খেলছে। দু'পাশে বাঁশের বার-পোস্ট—একদিকেরটা অনেকটা হেলে পড়েছে। জয়ন্ত ছেলেমানুষের মত আব্দারের সুরে বিকাশকে বলল, 'গাড়িটা একটু থামাবেন? ...কতদিন ফুটবল খেলি না, পা-টা নিসপিস করছে।' বিকাশ গাড়ির গতি একটুও কমালো না, শুধু বলল, 'এসব এবড়ো খেবড়ো মাঠ, তায় জলকাদায় অসম্ভব পেছল, এক পা দৌড়তে না দৌড়তেই একেবারে পা পিছলে আলুর দম হয়ে যাবেন।'

জয়ন্ত তাও ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগল, 'ছোটবেলায় তো এরকম মাঠে কত খেলেছি। মালদহে ঝলঝলিয়ার রেলওয়ে কোয়ার্টার্সের মাঠটাও তো...।'

—'আঃ, সেসব দিন আপনার নেই। আপনি এখন ফুটবল দুনিয়ার সুপার স্টার।'

জয়ন্ত এবার চুপ করে গেল। দ্রুত ছুটছে...কানের পাশ দিয়ে হাওয়া কাটার শন্‌শন্ শব্দ। পেছনের সিটে বচন সিং-এর নাক ডাকার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

পথে পরপর অনেকগুলো সাঁকো পড়ল। সাঁকো পেরোতে পেরোতে বিকাশ একসময় বলল, 'আরামবাগ ছাড়ার পরও দুটো গাড়ি পেছন পেছন এসেছে। এখন একটাকে দেখছি না।'

আকাশে হালকা মেঘ আছে, মেঘ চুঁইয়ে একরকম ফ্যাকাশে রোদ পড়ে রাস্তার দু'পাশের ধানগাছগুলো কেমন নিস্তেজ মনে হচ্ছে।

দিগন্ত বিস্তৃত ধানক্ষেতের মধ্যে অনেক দূরে দূরে দু' একটা লোক। জয়ন্ত গভীর মনোযোগের সঙ্গে এসব দেখছিল। বিকাশের মাথার মধ্যে পিছু তাড়া করা গাড়ি দুটোর চিন্তা গেঁথে গেছে ও কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না।

একসময় হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে জয়ন্ত চমকে উঠল। বিকাশ আচমকা গাড়িটা রাস্তার এক ধারে কিনার ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। জয়ন্ত দেখল একটা আকাশী রঙের অ্যামবাসাডার গাড়ি দ্রুত বেগে বেরিয়ে গেল ওদের পাশ দিয়ে। গাড়ির জানালায় জয়ন্ত একটা চোয়াড়ে গুণ্ডা ধরনের মুখ দেখল, মনে হল লোকটাকে সে আগে দেখেছে। বোধহয় যোগোর বাড়িতে থাকার সময়ই।

জয়ন্ত একটুক্ষণ ভাবল। বিকাশ স্টীয়ারিং-এ হাত রেখে আকাশী গাড়ির চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইল। রাস্তার পাশে ঘাস জমিতে তাদের গাড়িটা এখন দাঁড়িয়ে। জয়ন্ত বুঝলো বিকাশ ভয় পেয়েছে, এতক্ষণ পিছু তাড়া করার কথাটা সে বিশ্বাস করেনি, এখন মনে হচ্ছে, হলেও হতে পারে। ও বিকাশকে সেকথা আর বলল না যে চেনা মুখ আকাশী গাড়িতে দেখেছে। একটু হেসে বলল, 'কি ব্যাপার —এভাবে থামালেন কেন?'

—'আপনি তো তোফা আরামে ধানক্ষেত-টেত দেখছেন···আমি ফিরে দেখি পেছনের আকাশী গাড়িটা হঠাৎ স্পিড নিয়ে আমাদের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। মনে হচ্ছিল পাশাপাশি ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার মতলব ছিল।'

এর মধ্যে পেছনের সিটে একটু নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল। বচন সিং উঠে বসেছে। বিরাট একটা হাই তুলে ভাঙ্গা বাংলায় জানতে চাইল টায়ার পাংকচার হয়েছে কি না?

জয়ন্ত বলল, 'যাই হোক আপদ তো চুকেছে। এখন চলুন রওনা দেওয়া যাক। বিষ্ণুপুর যখন যাচ্ছি, থাকার জায়গা বলতে ওই একটিই —সরকারী ট্যুরিষ্ট লজ। কলকাতার বাস আসার সময় হয়ে গেছে, বাস পৌঁছে গেলে লজে আর জায়গা পাবেন না।'

খানিকটা অনিচ্ছার সঙ্গেই বিকাশ গাড়িতে ষ্টার্ট দিল। একটু এগোতেই সামনের পথটা উঁচু হয়ে উঠেছে। দূর থেকে বনভূমির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আর একটু পরেই ওরা জয়পুরের বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।…দু'পাশে শাল সেগুনের বন, মাঝখানে মসৃণ বাঁকানো রাস্তা। এসব রাস্তায় গাড়ি ঘন ঘন যাতায়াত করে না, তবু একটানা রাস্তাটা যেই বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল, তখন মনে হল বুঝি এই একটা গাড়িই সারাদিন রাত্তিরে এই রাস্তার জন্য বরাদ্দ।

স্পিডোমিটারের কাঁটা সত্তরের ঘরে থরথর করে কাঁপছে। বিকাশ এক দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে, হাত দুটো স্টীয়ারিং হুইলকে শক্ত করে আঁকড়ে আছে। বিকাশের দেহটা একটু ঝোঁকানো, চোখের ভাবটা এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগের নেকড়ের চোখের মত। পিছনের সিটে বচন সিং এখন আর ঘুমোচ্ছে না, উঠে বসেছে।

হঠাৎ একসঙ্গে জয়ন্ত আর পেছনের সিট থেকে বচন সিং অদ্ভুত একটা বিকৃত আওয়াজে চেঁচিয়ে উঠল। বিকাশও দেখেছিল। দেখেছিল একটা লোক অত্যন্ত দ্রুত রাস্তার এদিক থেকে ওদিক ছুটে বেরিয়ে গেল। ব্রেক না কষলে বোধহয় লোকটাই চাপা পড়ত।

আচমকা গাড়ি থামায় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, আবার যখন ঠিক অবস্থান ফিরে এলো, তখন লক্ষ্য করলো একটা বেশ মোটা কালো রঙের নাইলনের দড়ি মাটি থেকে ফুট দুয়েক উঁচুতে রাস্তার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। মনে হয় এক্ষুণি যে লোকটা গাড়ি চাপা পড়ার হাত থেকে বেঁচেছে, সে-ই দড়ির একটা প্রান্ত এদিক থেকে ওদিকে নিয়ে গেছে।

বিকাশ চেঁচিয়ে উঠল, 'নেমে পড়ুন গাড়ি থেকে, না হলে— পুরো কথাটা না বলেই ডান দিকের দরজা খুলে বিকাশ নেমে পড়ল। বচন সিং-ও সমান তৎপর। বিপদের গন্ধ পেয়ে ওর পেশীগুলো ফুলে উঠেছে। তাছাড়া গাড়ির যাতে কোন বিপদ আপদ না হয়, সেটা তো তাকেই দেখতে হবে। জয়ন্ত সবশেষে গাড়ি থেকে নামার সময় বাঁকিদের

জঙ্গলে চোখ পড়ায় দেখতে পেল শালগাছের ফাঁকে আকাশী অ্যাম্বা-সাডারটাকে।

জয়ন্তর মনের মধ্যে একটা নিশ্চিন্ত ভাব কয়েকদিন ধরে বিরাজ করছিল। ও ধরেই নিয়েছিল ক্লাব ওকে বর্জন করবে, সেক্ষেত্রে হয়ত ছোট দলেই জায়গা খুঁজে নিতে হবে ওকে। জয়ন্ত ঠিক করেই রেখেছিল এক বছর কি বড়জোর দু'বছর নির্বাসন দণ্ড ভোগ করার পর সে আবার শাপমুক্ত হয়ে নিজের যোগ্য সম্মানে অধিষ্ঠিত হবে। এটা মেনে নিয়েছিল বলেই পি. সি ঘোষ, ভবেনদার রক্তচক্ষুর বা সমর্থকদের ক্রোধ, হিংসার ভয়টা ওর মনের মধ্যে ফিকে হয়ে গিয়েছিল। জয়ন্ত মনে মনে ভেবেছিল, আমি যখন স্বেচ্ছায় শাস্তিটা মাথা পেতে নিচ্ছি, আমার কোন দোষ ছিল কি ছিল না, তা নিয়ে যখন কোন প্রশ্ন তুলিনি, তখন তো তোমাদের সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই। কিন্তু জয়ন্তর এসব কথাই তো মনে মনে নিজের সঙ্গে। প্রতিপক্ষ জানবে কী করে? তবু যখন জয়ন্ত দেখল তার প্রতিপক্ষ, সে যেই হোক না কেন একটা খুব নিচু স্তরের ভিলেনি করছে, অনেকটা যেমন হিন্দি ছবিতে দেখা যায়, তখন তার খুব অভিমান হল। ও নিজেকে বাঁচাবার কোনরকম চেষ্টা না করে খানিকটা স্বপ্নাচ্ছন্নের মত গাড়ির কাছ ঘেঁষে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল।

এমন সময় হুদ্দাড় করে জনা পাঁচেক লোক হাতে খেঁটে লাঠি নিয়ে ছুটে এল। লোকগুলো চলাফেরায় অত্যন্ত তৎপর। বাকিদের জয়ন্ত জানে না, তবে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা ঘুসি মারতে হাত ওঠালে জয়ন্তও হাত তুলে বাধা দিতে গেল। কিন্তু আঘাতটা এল সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে। ঘুঁষি মারার হাতটা শূন্যেই তোলা থাকল, বাঁ পা টা আন্দোলিত হয়ে পেটের ওপর দিকটায় পাঁজরার কাছাকাছি আঘাত করল। জয়ন্ত হুমড়ি খেয়ে পড়ে দু চোখে সর্ষে ফুল দেখল। তখন অনেক দূর থেকে আসা শব্দের মতন কানে এলো, 'আমরা স্সাপোর্টার, আমাদের কাছে ও—স্সব কায়দা চলবে না। পেঁদিয়ে ফেলাট করে দেবো।'

লাথি খেয়ে মাটিতে পড়েও ও উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। ফুটবল খেলার অভিজ্ঞতায় চোট সামলাবার ক্ষমতা আছে ওর। জয়ন্ত তার ব্যথার জায়গাটা ডান হাতে চেপে ধরে উঠে দাঁড়িয়ে উল্টো দিকে ছুটতে লাগাল। স্বভাবই আক্রমণকারীরা অনেক বেশী তৎপর। ও ছুটে পালাতে গিয়েছিল, কিন্তু খেঁটে লাঠির হুটো মোক্ষম ঘা ওর পিঠে আর কাঁধে এসে পড়ল।

এখন জয়ন্ত মাটিতে বসে পড়েছে। ও মুখ তুলে দেখল ওকে ঘিরে তিনজন দাঁড়িয়ে। জয়ন্তর শরীরে মারাত্মক আঘাতগুলোর যন্ত্রণাবোধ এখন আর নেই, সেসব কিছুকে ছাপিয়ে একটা তীব্র ভয়, ঠাণ্ডা স্রোত হয়ে শিরদাঁড়া দিয়ে বয়ে চলেছে। ও ভয় পাওয়া জন্তুর মত মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করল। ভয়ের দাপটে ওর চিন্তা বুদ্ধি সব নিস্তেজ হয়ে আসছে। ও একসময় চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে সামনে দাঁড়ানো লোকটার দিকে প্রায় চোখ বন্ধ করে প্রচণ্ড রেগে একটা ঘুসি ছুঁড়ে দিল। লোকটা প্রস্তুত ছিল না, তাই আত্মরক্ষার কোন চেষ্টাই করতে পারেনি, ঘুসি খেয়ে 'বা-প!' বলে লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। আর ঠিক তখনই হুটো লাঠি আবার একসঙ্গে সজোরে ওর শরীরে আঘাত করল। একটা বাড়ি কপালের ওপর দিকে লাগল। আবার মাথা ঘুরে যাচ্ছিল, জয়ন্ত সামলে নিল। কপাল থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। চোখের ওপর এত বেশী রক্ত গড়াচ্ছে যে ও ডানদিকের চোখটা খুলে রাখতে পারছে না।

এমন সময় গাড়ির আড়াল থেকে বচন সিং-এর গলা শোনা গেল। কথাটা ঠিক বোঝা গেল না, তবে মনে হল অনেকক্ষণ ধরে লড়াই করার পর এবার ও জিতেছে। বচন সিং হুঙ্কার দিয়ে বোধ হয় পরাজিত লোকটাকে সজোরে আঘাত করল, লোকটা চেঁচিয়ে উঠল 'আঁ—আঁ' করে। আর তক্ষুনি জয়ন্তর সামনে থেকে তিনজনই সেদিকে ছুটে গেল।

বিকাশ নন্দীকে কব্জা করতে দুর্বৃত্তদের একটুও সময় লাগেনি। হাত হু'খানা ধরে পেছন দিকে মুচড়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন। যে লোকটি ধরেছিল সে বিহারী, ইয়া গোঁফ। সে ডান হাতে বিকাশের হু'

হাতের কব্জি একসঙ্গে করে শক্ত মুঠিতে ধরে, বাঁ হাত দিয়ে উদাস ভাবে গোঁফ পাকিয়ে যাচ্ছে। বিকাশ হাত ছাড়াবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে যাচ্ছে। লোকটার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। এমনকি বচন সিং যখন তার দলেরই একজনকে পেড়ে ফেলে উত্তম মধ্যম দিচ্ছে, তখন বাদবাকিরা ছুটে গেলেও, এ লোকটি স্থির নির্বিকার।

জয়ন্তকে এখন আর কেউ মারছে না বা ঘিরে দাঁড়িয়ে নেই। ও উঠে দাঁড়াল। পা দুটো যেন নরম রবারে তৈরি,হাঁটতে গেলে বেঁকে যাচ্ছে। ও ঠিক কী করতে চায় এ মুহূর্তে তা সে নিজেও জানে না। বচন সিংকে ঘিরে তিনজন দাঁড়িয়ে একধার থেকে ঘুসি-টুসি ছুঁড়ে যাচ্ছে। সে-ও বক্সারদের মত আগুপিছু করে পাল্টা আক্রমণ করে চলেছে। একটু আগে বচন যে লোকটাকে হারিয়েছে, সে এখন ঘাসে মুখ ঘসছে আর মৃদু স্বরে গোঙাচ্ছে।

এমন সময় বিকাশকে যে লোকটা ধরে দাঁড়িয়েছিল, সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'দো নম্বর গাড়ি আ গয়া।'

একথা শুনেই সকলে হৈ চৈ করে দ্রুত জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। ওদের আকাশী অ্যাম্বাবসাডারটা সেখানে ছিল, গাড়িতে উঠেই স্টার্ট দিল। তখন রাস্তার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ওরা তিনজন দাঁড়িয়ে। আকাশী গাড়িটা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসার পর, যে লোকটা বিকাশ নন্দীকে ধরেছিল, সে ড্রাইভারকে কি বলে নেমে জয়ন্তর কাছে এল। তারপর পরিষ্কার বাংলায় খুব বিনীতভাবে বলল,'দাদা কিছু মনে করবেন না। আপনাকে মারার জন্যই আমরা এতদূর এসেছি। বাকি দু'জনকে একেবারে না মারলে খারাপ দেখায় বলে ওই একটু হোমিওপ্যাথি ডোজ দিতে হল। আমি জন্মে ফুটবল খেলিনি বড় ফুটবল খেলা দেখিওনি। তবু একটা প্লেয়ারকে ঠেঙাবার জন্য আমাকে একশো টাকা দেওয়া হল, এতটা পথ সুন্দর গাড়ি চড়লাম। আমি কিন্তু আপনার গায়ে একটু হাতও দিইনি।...'

লোকটার হয়ত আরো কিছু বলার বাসনা ছিল, কিন্তু গাড়ির অন্য লোকেরা ব্যস্তভাবে তাড়া দেওয়ায় সেই গোঁফওয়ালা লোকটি ছুটে

গিয়ে গাড়িতে উঠল। বচন সিং-এর ইচ্ছে ছিল একা পেয়ে লোকটাকে দেয় দু' চার ঘা। কিন্তু বিকাশ ওকে জোর করে আটকে রাখল।

এমন সময় একটা লাল রঙের পুরনো মডেলের ফোর্ড গাড়ি এসে পৌঁছল। গাড়িটা থামা মাত্রই চারটে দরজা খুলে চারজন ছিটকে বেরিয়ে এল। ছোট্টুদা দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে এল, 'জয়ন্ত রে!'

ছোট্টুদার আবেগটা কাটতে একটু সময় লাগল। এর মধ্যে রাস্তার দু'দিক থেকে দু'চারটে গাড়ি গেছে। তারা সকলেই অবাক দৃষ্টি ফেলে শেষ পর্যন্ত ভ্রুক্ষেপ না করে যেমন আসছিল তেমনি চলে গেছে। তবে মারপিটের সময় কোন গাড়ি এসে পড়লে হয়ত মারধোরটা একটু কম হত।

বিকাশ নন্দী এমনিতে খুব বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। কিন্তু দৈহিক আক্রমণের মুখে পড়ে খানিকটা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। এখন আবার স্বাভাবিক বুদ্ধি ফিরে এসেছে। ছোট্টুদার সঙ্গে নিজে থেকেই আলাপ করে খুব সংক্ষেপে সব কিছু বুঝে নিয়েছে। এখন ওরা একটা মহুয়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে নীচু গলায় কথা বলছে। ওদের মধ্যে কথা হচ্ছিল আহত জয়ন্তকে এখন কোথায় নিয়ে যাওয়া যায়। বিকাশ একটা পরামর্শ দিতেই ছোট্টুদা সজোরে মাথা নেড়ে বলল 'দ্য আইডিয়া!'

তারপর যে যার গাড়িতে উঠে পড়ল। ছোট্টুদার লাল গাড়িটা আগে আগে যাচ্ছে, পেছনে জয়ন্তদের গাড়ি। জয়ন্ত চোখ বুজে বসে আছে, কপালের ক্ষতস্থানের ওপর রুমাল বাঁধা। রুমালটা রক্তে ভিজে উঠেছে। জয়ন্ত একবারও জানতে চাইল না, গাড়ি এখন কোথায় যাচ্ছে।

চোখ বুজে থাকতে থাকতে একসময় জয়ন্তর ঝিমুনির মত এল। মনে হল ও এক গভীর নীল সমুদ্রের পাতালের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। সেভাবে তলিয়ে যেতে জয়ন্তর খারাপ লাগল না, বরং সে অনায়াসে স্বচ্ছন্দে শরীরটা ছেড়ে দিয়ে খুশী হল। জয়ন্ত এক অতলস্পর্শী গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে আর, চলন্ত রেলগাড়ির জানালা থেকে যেমন টেলিগ্রাফের

খুঁটি কি একটা গাছ দ্রুত সরে যায়, তেমনি ওর চেতনার মধ্যে মুহূর্তের ঝিলিক দিয়ে একটা ঘটনা চলে যাচ্ছে।

ম্যাচের দিন দুপুরবেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ও আর ছোট্টুদা খেতে বসেছিল। ছোট্টুদার মুখটা তখন কী সুন্দর হাসিখুশী। তুলনায় জয়ন্ত অনেক গম্ভীর। ওরা খেল এক বাটি করে চিকেন স্যুপ, মাছভাজা দু'টুকরো, গাজরের তরকারি দিয়ে ঠিক এক হাতা ভাত, দুটো বড় আকারের রসগোল্লা। জয়ন্তর গাজরের তরকারির ব্যাপারে একটা সংস্কার আছে বলা যায়। অনেকদিন ধরেই টাফ ম্যাচ থাকলে ও গাজরের তরকারি খাবেই।

ছোটবেলায় মা গাজরের লাল দেখিয়ে বলত, 'এটা খাওয়া মানেই শরীরে রক্ত বাড়া। দেখছিস না কেমন রাঙা রাঙা চেহারা!' মায়ের কথাটা তখন থেকেই এমনভাবে মনের মধ্যে গেঁথে গেছে যে, গাজরের তরকারি খেলেই শরীরটাকে মনে হয় নতুন চার্জ করা তাজা চনমনে ব্যাটারির মত।

সিনেমার জাম্প কাটের মত খাবার টেবল থেকে সোজা চলে এল ক্লাব টেণ্টে। খেলা শুরুর আর বেশি দেরি নেই। ওরা ড্রেস করে সকলে সার বেঁধে দাড়াল। প্রত্যেকেই খুব গম্ভীর। নিতাই ছিল সৌম্যেনের বদলি গোলকিপার! ওছাড়া বাদবাকি আর সব ভারী সিরিয়স। নিতাই লুকিয়ে লুকিয়ে ওর দু'পাশে দাঁড়ানো কল্লোল আর যোগোর প্যাণ্ট ধরে টানছিল, উরুতে চিমটি কাটছিল। ওরা বিরক্ত হলেও চেঁচামেচি করতে পারছে না। সামনে পি. সি ঘোষ দাঁড়িয়ে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে কোচ রমেনদা, লম্বা মুখটা গাম্ভীর্যের ভারে আরো খানিকটা ঝুলে পড়েছে। মাঠ ভর্তি দর্শক, তাদের কোলাহল শোনা যাচ্ছে। টেণ্টের ভেতরে বা গ্যালারিতে এখন সমান উত্তেজনা। পি. সি গম্ভীর ভাবে বললেন, 'আজ তোমরা এই এগারোজন সৈনিক ক্লাবের মান রক্ষার জন্য, নিজেদের খেলোয়াড়ী প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেহের শেষ রক্ত-বিন্দু দিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবে। একটা কথা মনে রেখো, আজ যদি তোমরা সাকসেসফুল না হতে পার, তবে সে পরাজয় শুধু ক্লাবের বা

তোমাদের ব্যক্তিগত পরাজয় বা ব্যর্থতা নয়। তোমরা একটা অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়ছো। জেনে রেখো, বিপক্ষ দলে আছে এগারোজন খেলোয়োড়, দুটি লাইন্সম্যান আর এক রেফারি। আর তোমরা শুধু এগারোটি খেলোয়াড়, তোমাদের সঙ্গীরা আরো অনেক বেশী শক্তিশালী —তারা হল ফুটবলের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, সত্য আর ন্যায় নিষ্ঠা। মধ্যযুগের ইউরোপে ধর্মপ্রাণ ক্রুসেডাররা খ্রীষ্ট ধর্মের নৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য…।' নিতাই কটাং করে যোগোর থাইতে চিমটি কাটল। যোগো বুট পরা পা-টা ঘোড়ার মত ছুঁড়ল। স্তব্ধ টেন্টে ওটুকু চঞ্চলতাই বড় মনে হল, পি. সি ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, '.. সেই ক্রুসেরডারদের মত ফুটবলের নৈতিক পুনরুজ্জীবন অর্থাৎ এ খেলার পবিত্রতা রক্ষা, এ খেলা যে হিম্মতের খেলা, স্কিলের খেলা, এ খেলা মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে উদার করে, সৎ হতে সাহায্য করে —এসব কথা প্রমাণ করার দিন আজ এসেছে। আমাদের ক্লাব তার জন্মলগ্ন থেকে সুস্থ ফুটবল চর্চার কেন্দ্র। আর সেই কর্মে তোমরা প্রত্যেকে এক একজন বিশিষ্ট কর্মী…।' নিতাই এবার চিমটি কেটেছে কল্লোলের পায়ে। কল্লোল টিমে চান্স পাবে কি না পাবে, সে ব্যাপারে একটা তীব্র টেনশনের মধ্যে ছিল। এখন টেনশনটা কেটেছে, তবে মনটা এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। কল্লোল তাই মোক্ষম একটা চিমটি খেয়ে হঠাৎ হাউমাউ করে উঠল। তারপর স্কুলের নিচু ক্লাসের ছেলের মত নালিশ করল, এই দেখুন না, আমাকে চিমটি কাটছে…।' ওর ছেলে-মানুষী নালিশের মধ্যে এমন একটা ব্যাপার ছিল, পি. সি আর কল্লোল ছাড়া আর সকলে হোহো করে হেসে উঠল। মিলিত হাসির দাপটে, তীব্র মানসিক চাপটা খানখান হয়ে গেল, ঠিক যেমন কুয়াশা কাটে সূর্যের আলোতে।

গাড়িটা বাড়ির সামনে থামায় ছোট্ট করে একটা ঝাঁকুনি দিল, আর তাতেই জয়ন্তর চেতনা ফিরল। ও প্রথমে চোখ বড় বড় করে বিহ্বল ভাবে তাকাল। বড় দরজাটা বন্ধ, পাশের ছোট্ট কাঠের দরজাটা অল্প

একটু ফাঁক করা। এখন বেলা ছুটো বেজে গেছে, রোদটা ঝকঝকে নয়। জয়ন্ত দেখল বাড়ির সামনের এই ঘাস জমিতে সে একদিন রাত্রিবেলায় জ্যোৎস্নায় ডুবে গিয়ে একটা অলীক হলুদ রঙের ফুটবলের পেছনে তাড়া করেছিল। মেঘের মধ্য দিয়ে ফিল্টার হয়ে আসা ম্লান রোদটা অনেকটা জ্যোৎস্নার মত। শেয়ালকাঁটার ঝোপে স্বচ্ছ হলুদ রঙের ফুলগুলো এখনো সে রাতের মত মোহময় মনে হচ্ছে।

দরজা খুলে জয়ন্ত নামতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ সে রুখে দাঁড়াল, 'আমাকে তোমরা এ বাড়িতে আনলে কেন?' ছোট্টুদা ততক্ষণে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, 'জয়ন্ত, তোর কোন ভয় নেই। সব গোলমাল এবার মিটে যাবে। তুই ভেতরে আয়, ছু'দণ্ড জিরিয়ে নে, তারপর আমি তোকে সব বলব। তোর যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেজন্য কলকাতা থেকে তোদের গাড়ির পেছনে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছি। মাঝপথে টায়ার পাংকচার হয়ে গেল, টায়ার বদলাতে একটু দেরি হয়ে গেল। না হলে…।'

জয়ন্ত ঘাড় গোঁজ করে ছোট্টুদার কথা শুনছিল। কপালের ওপর একটা রুমাল বাঁধা, মুখের একটা দিকে গড়িয়ে পড়া রক্ত শুকিয়ে গিয়ে বীভৎস দেখাচ্ছে। এর সঙ্গে একটা ঘোলাটে চোখের চাহনি মিলে জয়ন্তকে উন্মাদ মনে হচ্ছিল। জয়ন্ত হঠাৎ ডান হাতটায় ঘুসি পাকিয়ে প্রচণ্ড জোরে ছোট্টুদার চোয়াল লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। অপ্রত্যাশিত আঘাতে ছোট্টুদা কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ল।

জয়ন্ত আরো আঘাত করতে যাচ্ছিল, পেছন থেকে ওকে বিকাশ জাপটে ধরল। জয়ন্ত খুব চাপা স্বরে গর্জন করছিল। 'ছেড়ে দাও আমাকে…আই উইল কিল হিম…আমাকে যারা—যারা মেরেছে, সকলকে আমি মারবো।'

বাইরে যে এত কাণ্ড হচ্ছে, বাড়ির লোকেরা তার কিছুই জানে না। বাড়িতে লোক বলতে এই মুহূর্তে ছোট্টুদার সেজদি আর বামুনদি। পাখি কলেজে, তিন্নি আর সুরঞ্জন স্কুলে। ওদের বাবা তার কাজে আর দাছু কোথায় যেন বেরিয়েছে।

ছোট্টুদার বেশ লেগেছে, চোয়ালটা চেপে ধরে অবাক হয়ে জয়ন্তর দিকে তাকেয়ে রইল। স্বাভাবিক আচরণে এই মুহূর্তে ছোট্টুদার খুব নাটকীয় কিছু একটা বলার কথা, কিন্তু সে খুব সরল একটা স্বীকারোক্তির মত বলল, 'ত্যুৎ পাগলা! আমি না রে, তোকে পি. সি ঘোষের ভাড়াটে গুণ্ডারা মেরেছে। তোকে মারতে পারে ভেবেই তো আমি বিভূতিদার সঙ্গে কথা বলে, তোকে বাঁচাবার জন্য ছুটে এসেছি। টায়ার পাংচার না হলে কে তোর গায়ে হাত তুলতো? দেখ না সঙ্গে বিদ্যুৎ আর বিষ্টুকে এনেছি।' জয়ন্ত মুখ তুলে দেখল লাল গেঞ্জি পরা বিদ্যুৎ আর বিষ্টু বুকের ছাতি ফুলিয়ে দু'হাত মুঠো করে ছোট্টুদার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

জয়ন্ত কপাল দিয়ে অনেকটা রক্তক্ষরণ হয়েছে। তার ওপর শরীরের অন্য আঘাতগুলোও খুব জোরালো। সব মিলিয়ে জয়ন্ত অসুস্থ বোধ করছিল। ওর শরীরটা কাঁপছিল থরথর করে। ও বিকাশকে বলল, 'চলুন বিকাশবাবু, আমরা কলকাতায় ফিরে যাই।' আর ঠিক সে সময় নিজেদের বাড়ির সামনে গাড়ি আর লোকজনের ভিড় দেখে তিন্নি ছুটতে ছুটতে এল। কি কারণে যেন ওর স্কুল দু পিরিয়ড আগে ছুটি হয়ে গেছে। ও ছুটে এসে জয়ন্তর হতে ধরল, 'ওমা জয়ন্তদা, তুমি আবার মার খেয়েছো··ইস্ কি মজা, আবার তুমি আমাদের বাড়ি থাকবে।' ওর কথা বলার ধরনে সকলে হেসে উঠল। তিন্নি বলল, 'তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এসো। জয়ন্তদার কপাল থেকে ইস্ কি রক্ত বেরোচ্ছে, ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হবে না—।'

তিন্নি জয়ন্তর হাত ধরে টেনে ভেতরে ঢোকাল, পেছনে পেছনে ভেতরে গেল বাকি লোকেরা। তিন্নির সরলতার সামনে জয়ন্তর সমস্ত রাগ ও প্রতিরোধ মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।

কলকাতা থেকে যে ক'জন এসেছিল, বিকেলের দিকে তাদের মধ্যে জয়ন্ত ছাড়া আর সকলে চলে গেল। জয়ন্ত তার সেই পুরনো তক্তপোষে শুয়ে আছে। মাথায় এখন বিরাট করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। একটু একটু জ্বর ভাব, ফাটা জায়গা টন টন করছে, সারা গায়ে ব্যথা। ছোট্টুদার সেজদি একবারও জয়ন্তর সামনে আসেনি, তবে সুরঞ্জন আর তিন্নি এতক্ষণ ওর

পাশে বসেছিল, এখন একটু ভেতরে গেছে। জয়ন্ত ঢুকেই লক্ষ্য করেছে ম্যাগাজিন থেকে কাটা তার রঙীন ছবিটা একই জায়গায় রয়েছে।

এ সময় পাখি ঘরে এসে ঢুকল, 'দিব্যি শুয়ে আছেন তো? এটা কি অ্যাসাইলাম—আর্তরুগীদের সেবাশ্রম? একবার করে মারধোর খাবেন, আর অমনি এসে পড়বেন ·।' কথাগুলো বলছিল পাখি হাসি হাসি মুখে কিন্তু কথায় হুল ছিল।

জয়ন্ত বলল, 'আমিও জানি না, কেন ওরা আমাকে এখানে নিয়ে এল।' পাখি বলল, 'ওরা বুঝতে পেরেছে কলকাতায় ফেরার সাহস আপনার নেই।'

জয়ন্ত একটু রেগে গিয়ে বলল, 'আমি আর কাউকে ভয়-টয় করি না। জেনে গেছি যাকে সিংহ বলে ভাবছি, সেটা আসলে সিংহের চামড়ার আড়ালে একটা গাধা।' পাখি বলল, 'এসব কি বলতে হয় বলেই বলা নাকি মন থেকে সত্যি সত্যি বলছেন?'

জয়ন্ত এবার অসহায় ভাবে পাখির দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'পি. সি ঘোষের ভাড়াটে গুণ্ডারা আমাকে মেরেছে। ইচ্ছে করলে ওরা হয়ত আমাকে মেরেই ফেলতে পারত, কিন্তু তা করেনি। আক্রমণের মুখে প্রথমটায় খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, এখন আর সেসব কিছু নেই। পি. সি ঘোষকে আমি এতদিন সমীহ করতাম, ভয় পেতাম, এখন বরং সেই আমার সামনে দাঁড়াতে ভয় পাবে। কথায় বলে না, যে অপরাধী তার নৈতিক বল অনেক কম থাকে।'

পাখি বলল, 'আমার কলেজের এক বন্ধু আপনাদের টিমের সাপোর্টার, কথায় কথায় বলছিল আপনাকে নাকি কোন টিম আর ডাকবে না। এবার থেকে আপনাকে খেপ খেলে বেড়াতে হবে।'

জয়ন্ত এ কথায় কি মজা পেল সে-ই জানে, ও একেবারে হো হো করে হেসে উঠে বলল, 'তা মন্দ হয় না। আমি একবার খেপ খেলে ছ'কেজি চাল আর একটা লাউ পেয়েছিলাম আর একবার খেপ খেলতে গিয়ে হেরে যাওয়ায় আমাদের ভাড়া করা তিনজন খেলোয়াড়কে তিন ঘণ্টা আটকে রেখেছিল।'

একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি স্বপ্ন দেখেন?' পাখি মুচকি হেসে বলল, 'তার মানে আপনি নিশ্চয়ই দেখেন। কাকে দেখেন? আমাকে?'

জয়ন্ত থতমত খেয়ে বলল, 'না, মানে আমি ফুটবলের স্বপ্ন দেখি। এখানে থাকতে একদিন আমি রাতের বেলায় দরজা খুলে বাইরের মাঠে চলে গিয়েছিলাম, স্বপ্নের মত ব্যাপারটা।'

পাখি খুব আস্তে প্রায় শোনা যায় না এভাবে বলল, 'একদিন ঘুমের মধ্যে আমি একটা ফুটবল ম্যাচ দেখছি। একটা ছেলে সিংহের বিক্রমে রক্ষণাভাগে খেলে যাচ্ছে। ঘামে ভিজে জামাটা গায়ের সঙ্গে লেপটে রয়েছে।' জয়ন্ত বলল, 'আমি আবার ওরকম খেলব।'

*

অনিবার্য কারণে ক্লাবের মিটিংটা একদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। পি. সি জয়ন্ত সম্পর্কে পুরো খবরটা না পেয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে চাইছিলেন না। সন্ধ্যেবেলা বারান্দায় বসে আছেন। লোডশেডিং চলছে। একটু দূরে একটা মোমবাতি মৃদু কাঁপা কাঁপা শিখায় জ্বলছে। এমন সময় রতুয়া এল। রতুয়াকে দেখে ভেতরে ভেতরে পি. সি সচকিত হলেন, তবে বাইরে তার কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। রতুয়ার কাছ থেকে সব কিছু শুনে বললেন, 'তোমাদের কাজ এবারের মত শেষ। আসছে কাল অফিসে ফাস্ট' আওয়ারে দেখা কোরো। এখন যেতে পারো।'

রতুয়া চলে যাবার পরই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন পি. সি। দ্রুত হাতে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরালেন। 'হ্যালো, কে বিভূতি? কি কাণ্ড শুনেছো। আমাদের জয়ন্তকে কারা নাকি অ্যাটাক করেছিল। ও বোধহয় বিষ্টুপুরের দিকে 'জয় রাইডে' গিয়েছিল। পথে জয়পুরের জঙ্গল আছে না, ওখানেই নাকি···কি কাণ্ড ভেবে দেখো, কলকাতা থেকে ফলো করে অদ্দূর গ্যাছে···তারপর ছি! ছি! এসব ফ্যানেদের অত্যাচারে···ক্ষতি হচ্ছে ফুটবলেরই।'

অন্যদিক থেকে খুব শান্ত স্বরে জবাব এল, 'আপনি এত সব খবর

পেলেন কী করে...।

—'ওই মানে একটা ফোন পেয়েছিলাম একটু আগে···উড়ো ফোন, নাম ধাম জানি না···।'

—'আপনার কাছে এধরনের ফোন প্রায়ই আসে, তাই না ? শিল্ড ফাইনালের আগেও তো একটা এসেছিল, জয়ন্তকে না খেলাবার জন্য।'

পি. সি অবাক হয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, 'যাঃ বাবা ! হাতি কি তবে পাঁকে পড়ল নাকি। ব্যাঙেও যে লাথি মারছে।' কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, দেখো বিভূতি, পুরনো কথা মনে রেখ না। জয়ন্ত তো আর ইচ্ছে করে সেমসাইড গোল দেয়নি। তোমরা সবাই মিলে ক্লিক করে ওকে ডিঙিয়ে সন্তোষ ট্রফিতে অন্য ছেলেকে খেলিয়েছো, সত্যি বলতে কি সারা বাংলা দেশে ওর পজিশনে ওর চেয়ে ভাল আর কে খেলছে ? প্লিজ বিভূতি···একটা কিছু করো। শুনলাম দুর্বৃত্তরা নাকি ওর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। এখন কোথায় কোন্ অবস্থায় রয়েছে কে জানে ? তুমি আর সবাইকে খবর দাও। আমরা অফিসিয়ালরা প্লেয়ারদের গার্জিয়ানের মত, ওদের বিপদেই যদি পাশে না দাঁড়াতে···হ্যালো বিভূতি·· হ্যালো যাঃ লাইন কেটে গেল।'

*

জয়ন্ত এখন ভালেই আছে। তবে মাথা জোড়া বিরাট ব্যাণ্ডেজটা দেখলে মনে হয়, এখনো অবস্থা খুব সঙ্গীন। বিকেল বেলা বারান্দায় চেয়ার পেতে জয়ন্ত, সুরঞ্জন, পাখি আর তিন্নি বসে গল্প করছে। মাধবী-লতা, হাস্নুহানা, আর যুঁই—তিনটেতেই প্রচুর ফুল ফুটেছে। তিনটের গন্ধ মিলে-মিশে এক বিচিত্র ব্যাপার হয়েছে।

এমন সময় পরপর দুটো গাড়ি দরজায় এসে থামল, পি. সি ঘোষ বাড়ির ভেতরে ঢুকেই বারান্দায় জয়ন্তকে দেখতে পেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে এসে জয়ন্তকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। পি. সি জয়ন্তকে জড়িয়ে ধরে ক্রমাগত বিলাপ করে যাচ্ছেন। তার মুখটা দেওয়ালের দিকে, জয়ন্ত সামনের বাগানের দিকে তাকিয়ে আছে। ও ছোট্টুদা, বিভূতিদা,

কোচ রমেনদার চোখের চাপা হাসির ঝিলিক দেখেই বুঝে গেল পি সি-র অভিনয়টা কারোর কাছেই গোপন নেই। জয়ন্ত ভেবেছিল সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, তখন দেখে নেয় একবার। কিন্তু বিভূতিদা চোখ টিপে ইশারা করলেন।

*

বিভূতিদা জয়ন্তকে বুঝিয়েছিলেন, সামনের ক্লাব ইলেকশনে পি. সি ঘোষের এই বজ্জাতির বদলা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে জয়ন্ত সন্তোষ ট্রফি খেলেছে, ডুরাণ্ড, রোভার্সেও ওকে দলে নেওয়া হয়েছিল। সন্তোষ ট্রফির খেলার সময়ই ওকে অন্য দুটো বড় ক্লাব থেকে অফার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ক্লাবের সমস্ত কর্মকর্তাদের অনুরোধ, যোগোর অনুরোধ, আর এই সামনের ইলেকশনেই পি. সি ঘোষের ভরাডুবি হবে, এই আশ্বাস পেয়ে জয়ন্ত মার্চ মাসে পুরনো টিমেই থেকে যাওয়ার জন্য সই করল।

এরপরও কিছু খবর আছে। ইলেকশনে পি. সি ঘোষকে হারানো যায়নি, তিনি তার স্বপদেই আছেন, বরঞ্চ বিভূতিদা হেরে গিয়ে টেণ্টে আশা বন্ধ করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে আই এফ এ লিগে তার ক্লাব আটটা খেলা খেলেছে, তার মধ্যে জয়ন্ত একমাত্র স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পুরো ম্যাচ খেলেছে; এছাড়া দুটো খেলায় শেষ দশ মিনিট করে খেলেছিল। এখন সে নিয়মিত ড্রেস করে সাইড লাইনের ধারে বসে থাকে। দর্শক গ্যালারি থেকে মাঝে মধ্যে টিটকিরি ভেসে আসে। জয়ন্ত তাদের মন্তব্য প্রায়ই শুনতে পায়, 'জয়ন্ত মিত্তির একটা বোগাস প্লেয়ার—ও ব্যাটাকে পার্মানেণ্ট বৈঠ্‌কি করে দিয়ে ভালোই করেছে। প্র্যাকটিসে তো দেখেছি।'

—'শুধু তাই কেন গুরু! গতবারের শিল্ড ফাইনালের কথা ভুলে যাচ্ছো?

জয়ন্ত এসব শোনে আর আনমনে ঘাসের শিষ ছিঁড়ে দাঁত দিয়ে কাটে। ও ভাবে, এবছরই কোন একটা মাঝারি দলে চলে গেলে ভাল হত। যোগো ওকে খেলানোর ব্যাপারে একটু হৈ চৈ করেছিল, কিন্তু

তাতে কিছু ফল হয়নি।

জয়ন্ত এখন ক্লাবেও খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে। ওর সঙ্গে কেউ আর সেভাবে কথা বলে না বা সেটা জয়ন্তর মনের ভুলও হতে পারে। ও নিজেই হয়ত কমপ্লেক্সে ভুগছে।

একদিন উয়াড়ির সঙ্গে খেলা। ৬০ মিনিট খেলা হয়ে গেছে, একটাও গোল হয়নি। এমন সময় জয়ন্তর জায়গায় এখন যে খেলছে কেরালার গোবিন্দন, তার পায়ে জোর চোট লাগায় জয়ন্তকে নামতে হল, নামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জয়ন্ত একটা বল পেল। বলটা টোকা দিয়ে সামনে ঠেলে দিল, তারপর জোরে পা চালিয়ে বলটা নিয়ে দ্রুত ভেতরে ঢুকে পড়ল। বলটা নিয়ে ডান দিক থেকে মাঠের বাঁদিকে এসে পড়েছে, শরীরের মোচড়ে আর পায়ের জাদুতে ওর পয়ের বাধাগুলো সরে সরে যাচ্ছে। গ্যালারি থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'ক্যাদ্দানি ছাখ···ব্যাটার এমনিই পারে না, আবার ওভার ল্যাপ করছে। জয়ন্তর পা-টা যেন সারাক্ষণ মাটি ছুঁয়ে থাকছে না, শূন্যে ভাসছে। ভারী সুন্দর শৈল্পিক কারুকার্য যেন। জয়ন্ত পেনাল্টি বক্স পর্যন্ত উঠে এল যেন মাখনের মধ্য দিয়ে ছুরি চালানোর মত মসৃণভাবে। সেখান থেকে স্কোয়ার পাস করলো যোগোকে। আর যোগো অনায়াসে বলটা পুস করে জালের দিকে ঠেলে দিল।

জয়ন্ত কান পেতে শুনল, সারা মাঠ ফেটে যাচ্ছে তার জয়ধ্বনিতে। মাঠের মধ্যে নিজের জায়গায় ফিরে আসতে আসতে জয়ন্তর মনে হল, তার শরীরটা মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছে না, এখনো শূন্যে ভাসছে। ও দু'কান ভরে মাঠের কোলাহল শুনতে থাকল।

—